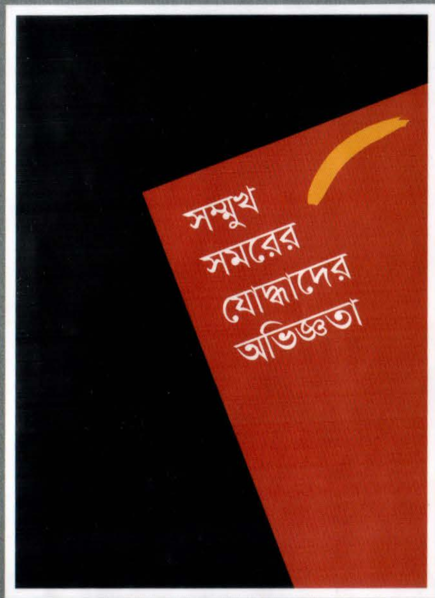
স্বাধীনতা

তৃতীয় খণ্ড

সম্মুখ
সমরের
যোদ্ধাদের
অভিজ্ঞতা

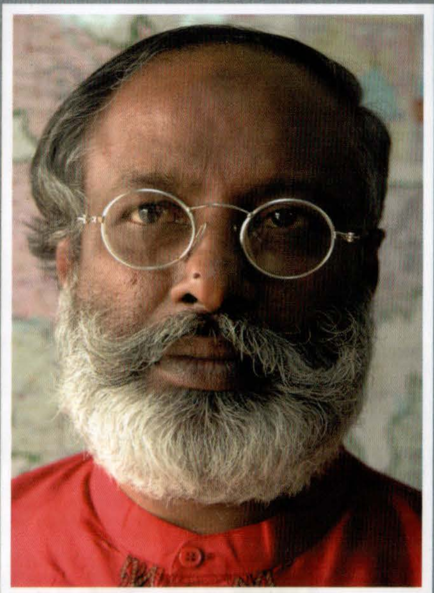
মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া
সম্পাদিত



স্বাধীনতা নামের ক্রমিক বইটি স্বাধীনতার লেখায় অর্থাৎ একাত্তরের রণাঙ্গনের লেখা নিয়ে সংকলিত। ভালো যোদ্ধারা, সাহসী সৈনিকরা যে ভালো লিখবেন তেমন কোনো কথা নেই। তবুও প্রয়াস অব্যাহত থাক, যদিও কাজটি মোটেও সহজ নয়। মুক্তিযোদ্ধাদের আজ যে বয়স তাতে ভবিষ্যতে যে সৃজনশীলতা নিয়ে কলম চলবে তা হবার কথা না, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই। ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন সাধের লেখা ভিন্ন ভিন্ন মুক্তিযোদ্ধারা লিখছেন একই মোড়কে তারওতো স্বাদ ভিন্ন।

আমি নিজে মরণকে স্মরণ করে কষ্ট পাই না। কেউ চিরজীবী নয়। তবে বাংলাদেশে একদিন একজনও মুক্তিযোদ্ধা থাকবে না—কথাটা মনে আসলে মনটা কেমন করে। সে জন্যই মুক্তিযুদ্ধটা থেকে যাক সেটাই বাসনা।

জীবনে সব আশা সত্যি হয় না। স্বাধীনতা প্রকাশও হয়তো বেশিদিন স্থায়ী হবে না। তবুও স্বপ্ন দেখি।



জন্ম : ২৪ জুলাই ১৯৫২। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে যখন তিনি এইচএসসি পরীক্ষার্থী, তখনই ডাক এল মুক্তি সংগ্রামে। যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধের ২ নম্বর সেক্টরে এক তরুণ গণযোদ্ধা হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের দুই কিংবদন্তি মেজর খালেদ মোশাররফ ও ক্যাপ্টেন হায়দারের সহযোদ্ধা হিসেবে তাদের পাশে পাশে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের হিরন্ময় দিনগুলিতে। একাত্তরের বীরযোদ্ধাদের পাশাপাশি নিজেকে শাণিত করেছেন স্বদেশপ্রেমের এক প্রগাঢ় চেতনায়। বাহাত্তরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নির্বাচিত হলেও বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠায় বিলম্বের কারণে চুয়াত্তরের ৯ জানুয়ারি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং পচাত্তরের ১১ জানুয়ারি সেনাবাহিনীতে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এ কমিশনপ্রাপ্ত হন। ১৯৮৩ সালে বেইজিং ল্যাংগুয়েজ এন্ড কালচার ইউনিভার্সিটি থেকে চীনা ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর ১২ জুলাই ১৯৯৬ সেনাবাহিনী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়ার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন-এ যেমন উচ্চ শাঘার, একমাত্র পুত্র শিশু সাবিতের মৃত্যু তেমনি তার হৃদয়ের গভীরতম ক্ষত। তবুও এ ক্ষত নিয়ে, এই বিক্ষত সময়ে তিনি সবুজআদৃত এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন।

সম্মুখ
সমরের
যোদ্ধাদের
অভিজ্ঞতা

ভূঁইয়া

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১১

স্বাধীনতা (তৃতীয় খণ্ড)
মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

প্রকাশক

CENTRE FOR
BANGLADESH
LIBERATION WAR STUDIES

সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ
এপার্টমেন্ট # ৪ বি, বাড়ি # ৪৪৮/এ
রোড # ৭ (পূর্ব), বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা ১২০৬
ফোন #০১৫৫২ ৪৪৯৪০৪, ০১৭১১ ৫৩৬৫০০
ই-মেইল : cblws 1971 @ yahoo. com

কম্পোজ
তন্বী কম্পিউটার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

একমাত্র পরিবেশক
অনন্যা
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
E-mail : anannyadhaka@gmail.com

U.K Distributor □ **Sangeeta Limited**, 22, Brick Lane, London
U.S.A Distributor □ **Muktadhara**, 37-69, 74 St., 2nd floor, Jackson Heights, N.Y 11372
Canada Distributor □ **Anyamela**, 300 Danforth Ave., Toronto (1st floor), Suite-202
Canada Distributor □ **ATN Mega Store**, 2970 Danforth Ave. Toronto

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা

Shadhinata (volume-3) edited by Major Qamrul Hassan Bhuiyan and also Published by him on behalf of Centre for Bangladesh Liberation War Studies, Apartment # 4B, House # 448/A, Road # 7 (East), Baridhara DOHS, Dhaka 1206. Cover Design by Dhrubo Esh. Price Taka : 150.00 Only US # 8

ISBN 984 70008 0024 4

উৎসর্গ

সকল শহীদ এবং একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে
যাঁরা দেশপ্রেমের প্রদীপ্ত শিখা অম্লান রেখেছেন

সম্পাদকের কথা

সার্বিক অর্থে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখালেখি যতটা বেশি হয়েছে ততটাই কম লেখালেখি হয়েছে আমাদের সম্মুখ সমর নিয়ে। এর কারণ নিয়ে আলোচনা করছি না। আমি শুধু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের ছেলেদের মাঠের অর্জনের কথা বলছি। স্বাধীনতার জন্য এ দেশের মানুষের সীমাহীন ত্যাগ ও প্রাণোৎসর্গের কথা বলছি। একাত্তরপূর্ব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এবং একাত্তরের রণাঙ্গনে এই মাটিবর্তী মানুষরাই ছিল প্রধান নিয়ামক। রণাঙ্গনে নিয়মিত বাহিনীর ব্যাটালিয়ানগুলিও ছিল নিম্নবর্তী সৈনিক নির্ভর এবং সে ইউনিটগুলির বৃহদাংশই ছিল ছ'সপ্তাহের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একাত্তরের ছাত্র, কৃষক, খেটেখাওয়া মানুষ। তারা অধিকাংশই তখনো কৈশোর পেরোয়নি। স্বাধীনতা ওদের কাছে একটি বাস্তব বিভাজক। বিভাজনের এই প্রক্রিয়া এবং ক্রমাগত সামাজিক শ্রেণীভেদ বৃদ্ধি তাদেরকে প্রান্তবর্তী করে ফেলেছে। লেখা আর কথায় মুক্তিযুদ্ধের এই ব্রাত্যজনদের উচ্চকিত প্রশংসা করা হলেও তার সঙ্গে শ্রদ্ধাবোধের দূরবর্তী কোনো সম্পর্ক নেই। 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান' আখ্যায়িত হয়ে তাদের তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধারা আগামী পনেরো বা বিশ বছরের মধ্যে এ পৃথিবী থেকে চলে যাবেন। যারা থাকবেন তারা বয়সের ভার কাঁধে নিয়ে বাঁচবেন বার্ধক্যজনিত রোগ বালাই নিয়ে। লেখালেখির সময় তখন আর তাদের থাকার সম্ভাবনা না থাকারই কথা।

প্রথাগত শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা যোদ্ধাদের সংখ্যাই ছিল অধিক। তারা লিখতে পারেননি। যারা হয়তো চেষ্টা করলে লিখতে পারতেন সেই সংখ্যালঘু শিক্ষিত যোদ্ধারা উদ্যোগী হননি। ফলে লেখা হয়েছে অতি সামান্য। ইতিহাসবেত্তা বা যাদের লিখিত উপস্থাপনা ভালো তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সেই অহংকারের কাহিনী 'কথ্য ইতিহাস' আকারে লিপিবদ্ধ করেননি। এ বিষয়ে সাহিত্য অঙ্গনের লোক যুদ্ধের মাঠে না থাকায় উঠে আসেনি আমাদের 'যুদ্ধ সাহিত্য'। ঢাকার পত্রিকা এবং ছাপা মাধ্যমগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের খ্যাতিমানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেননি বলে তাদের যুদ্ধকাহিনীগুলো ছাপেনি। অথচ এই যুদ্ধকথা লিপিবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য।

'সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ' মুক্তিযোদ্ধাদের লেখা ছাপাবে— এই প্রত্যয় নিয়ে তাদের লেখা সংগ্রহ করছে। মুক্তিযোদ্ধারা যেন পরবর্তী প্রজন্ম দ্বারা এই দোষে দুষ্ট আখ্যায়িত না হন যে তারা তাদের যুদ্ধকথা রেখে যাননি। এই বই সেই প্রয়াসে প্রথম প্রকাশ। আশা করি স্বাধীনতা পর্যায়ক্রমিক প্রকাশ আমরা অব্যাহত রাখতে পারবো।

ঢাকা
জানুয়ারি ২০০৭

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

দ্বিতীয় খণ্ডের কথা

যৌক্তিক কৈফিয়ত থাকলেও স্বাধীনতার (দ্বিতীয় খণ্ড) বের হবার বিলম্বের জন্য আমিই দায়ী। যে যোদ্ধাদের লেখার চল নেই তাদেরকে দিয়ে লেখানো কষ্টকর। লেখাগুলি সাহিত্যের বিচারকের দৃষ্টি দিয়ে না দেখতে অনুরোধ রইলো। তবুও অব্যাহত থাক স্বাধীনতার প্রকাশ।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০১০

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

তৃতীয় খণ্ডের কথা

প্রচণ্ড অসুস্থতা নিয়ে প্রচণ্ড কষ্ট করে স্বাধীনতা (তৃতীয় খণ্ড) প্রকাশ করা হল। সে কারণেই কলেবর ছোট হয়ে গেছে। তবুও বের করা গেল সেখানেই স্বস্তি।

এ বইয়ে যে সকল সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নাম এসেছে তারা সবাই অবসরপ্রাপ্ত।

ঢাকা | মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

ফেব্রুয়ারি ২০১১

সূচিপত্র

সাধারণ মানুষের অসাধারণ যুদ্ধ / ১৩
মাহবুব আলম

জনযুদ্ধের গণযোদ্ধারা / ২৩
মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া (অব.)

স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের ক্রান্তিকাল / ৩০
ডা. মৃগেন কুমার দাস চৌধুরী

টু স্যার, উইথ লাভ / ৩৬
ফাতেহ আলী চৌধুরী

মুক্তিযুদ্ধে বেরুবাড়ী / ৪০
মেজর মোহাম্মদ শামসুল হক

বীর উত্তম লে. সামাদ যেভাবে শহীদ হয়েছিলেন / ৪৬
ক্যাপ্টেন (মুজাহিদ) আজিজুল হক, বীরপ্রতীক

স্মৃতিভরা একাত্তর—নয় নম্বর সেক্টরের কয়েকটি যুদ্ধ / ৫০
ক্যাপ্টেন এম নুরুল হুদা

চাঁদপুর অঞ্চলে প্রতিরোধ যুদ্ধ / ৫৭
প্রকৌশলী মো. দেলোয়ার হোসেন

একাত্তরের সংক্ষিপ্ত জবানবন্দি / ৬৪
সৈয়দ মঈনুর রহমান

একাত্তরের কথকতা / ৭১
অনারারী ক্যাপ্টেন মো. আফাজুল হক

ফেনীর ফুলগাজী রেলস্টেশন অপারেশন / ৮৫
গোলাম মুস্তাফা

চোখ মেলে দ্যাখা / ৯৪
কামরুল হাসান ভূঁইয়া

সাধারণ মানুষের অসাধারণ যুদ্ধ

মাহবুব আলম

পঞ্চগড়ের তালমাপোরের টগবগে যুবক মতি, সাবেক মুজাহিদ সদস্য। রাজাকারে ভর্তি হওয়ার ডাক ও প্রলোভন এসেছিল, যায়নি। কেনো যাবে? সে তো জয় বাংলার লোক। আমাদের বিশ্বস্ত গাইড। রাতের আঁধারে ছেলেদের নিয়ে তার বাড়ির সামনে হাজির হলেই সে বের হয়ে আসত। মুখে সেই পরিচিত হাসি মাখিয়ে বলত, 'মুই রেডি হয়্যা বসি আছো গে, কবুনঠে যাবা হবে কহেন, কী নিবার হবে দ্যান।' বলে সে এক্সপ্লোসিভ ও মাইনের বোঝা কাঁধে চাপিয়ে নিত। বলত, চলেন, এদিকটা আজ নিরাপদ, খান আসেনি।

এভাবে মতি প্রায় রাতেই আমাদের সঙ্গী হতো। তার বিশ্বাস, অপারেশন সফল হলেই জয় বাংলা কায়েম হবে। জয় বাংলা না হলে তার কী হবে? মাতবরের কাছে তার বাঁধা দেওয়া জমি উদ্ধার হবে না, হালের বলদ হবে না, ভেঙে পড়া ছনের ঘরের ছাউনি হবে না। প্রায় নিঃস্ব মতিকে আবার হয়তো ফিরে যেতে হবে তার পিতৃপুরুষের ফেলে আসা কুমিল্লা জেলায়। তাই মতি স্বাধীনতা চায়, খুব আন্তরিকভাবে জয় বাংলাকে পেতে চায়।

স্বাধীনতার বেশ কয়ক বছর পর মতির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেই খেটে খাওয়া মজুর মতি আজও তেমনই আছে। জয় বাংলা ঠিকই এসেছে। গামছায় চোখের পানি মুছতে মুছতে মতি বলে, আমার কিছু না হোক, জয় বাংলা তো হয়েছে।

করতোয়াপারের (বোদা, পঞ্চগড়) হাসান মাঝি ছিল ভারতীয় শরণার্থী শিবিরে। তার বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের হাইডআউট, খবর শুনেই সে সেখান থেকে ছুটে এসেছে। রাতে সে তার নৌকা নিয়ে বসে থাকে খেয়াপারে। অপারেশনে যাওয়ার সময় মুক্তিযোদ্ধাদের পার করে দেয়। আবার তারা ফিরে আসবে। রাতভর জেগে নৌকায় বসে থাকে।

এক রাতে মারেয়ায় ধুন্ধুমার যুদ্ধ শেষে ভোরে ভোরে আমরা শ্রান্ত-বিধ্বস্ত অবস্থায় ফিরছি। হাসান মাঝি তার খেয়ানৌকা নিয়ে বসে আছে। খুব আপন মনে হয় তাকে। উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে সে। তখন মনে হয়, হাসানেরা আছে বলেই আমরা যুদ্ধ করছি। খেয়ানৌকার মাঝি হাসানের জন্যও তো স্বাধীনতা প্রয়োজন। তার বিশ্বাস, দেশ স্বাধীন হলে ওর সব দুঃখ-কষ্ট দূর হবে। করতোয়াপারের হাসান মাঝির দুচোখে তাই গভীর স্বপ্নাবেশ। সে জন্য এ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে সেও একজন সৈনিক। যুদ্ধের ওপর হাসান তার খেয়ানৌকা চালিয়েছে। এখন তার ছেলে চালায়। অশীতিপর বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত হাসান মাঝি এখনো ঘোরের মধ্যে তার স্বপ্নের জয় বাংলাকে খোঁজে। মুখে বলে, 'কই কিছুই তো হইল না গে বা।'

কালা হাজি (ভিতরগড়ের) মকতুকে দিয়ে দেন মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে গাইড হিসেবে। সে বলে, 'লন, যাইগা।' কালো শরীর যেন গ্রানাইট পাথরে তৈরি। অন্ধকারে তার সাদা দাঁত চকমক করে ওঠে। বলি, তুমি আমাদের শালমারা ব্রিজ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে? অন্ধকারে দাঁতের ঝিলিক দেওয়া হাসি দিয়ে সে বলে, 'পারমু, এই এলাকা আমার কাছে ঝকঝকা কাচের মতো পরিষ্কার।'

পথ ছেড়ে ধানখেত, তারপর জলাভূমি। ভূতের মতো মকতু সামনে এগোয়, যেন দৌড়ে চলে, তার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে আমরা হাঁপিয়ে উঠি। বলি, আর কত দূর মকতু? এ কাছেই, বলে মকতু উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। রাতের আঁধারে আমরা কোনো দিশদিশা পাই না। শত্রু এলাকায় এসে দিগ্‌ভ্রান্ত হলেই বিপদ। আর মকতু যদি পাকিস্তানি চর হয়, তাহলে আমাদের কয়েকজন যুবককে সে নিয়ে তুলবে একেবারে শত্রু পাকিস্তানি ঘাঁটিতে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে ওকে বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নেই। খেতবাড়ি, জলাভূমি, আলপথ, ধানখেত, ঝোপঝাড়, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মকতু আমাদের নিয়ে হাজির করে শালমারা ব্রিজের মুখে। পাকিস্তানি সেনাদের কোনো অবস্থান আছে কি না নিজেই সে দেখে আসে আগ বাড়িয়ে। না, ওরা নেই। আমরা শালমারা ব্রিজের রেকির কাজ সেরে নিই।

এবার মকতু বলে, চলেন, মুসলিম লীগ শান্তি কমিটির সদস্য শামসু মেম্বারকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে আসি। আবার তাকে আগের মতো অন্ধ অনুসরণ। পথ ছেড়ে অপথ, মহারাজার দীঘিরপাড় ঘেঁষে পাটখেত, ধানখেত, বুকসমান-কোমরসমান পানি পেরিয়ে শামসু মেম্বারের বাড়ি। ধমাধম গ্রেনেডের বিস্ফোরণ। প্রথমদিনের সফল অপারেশনের গাইড মকতু মিয়া এর পর হয়ে যায় আমাদের স্থায়ী গাইড। তালমা ব্রিজে, জগদল হাটে, চৈতন্যপাড়া ব্রিজে—এমন বহু অপারেশনে আমাদের পথ দেখায় সে। কখনো তার কাঁধে কোদাল, কখনো কাঁধে বিস্ফোরকের বোঝা, কখনো গুলির বাক্স। প্রায় প্রতিটি যুদ্ধে মকতু আমাদের ছায়াসঙ্গী, বিশ্বস্ত বন্ধু, গাইড। কথা সে খুব কম বলে। যখন বলে, বলে একদম খাঁটি কথা। তাকে বলি, প্রতি রাতে তুমি আমাদের সঙ্গী হও কেন? জবাবে সে বলে, 'কেন হমু না, জয় বাংলা খালি তোমারলাক লাগিবে, হামার লাগিবে নাই? দিনমজুর কিষাণ, প্রায় ভেঙে পড়া ছনের ঘর নিয়ে সংসারযুদ্ধে টিকে থাকা মকতু মিয়া স্বপ্ন দেখে, মুক্তিদের সঙ্গে থাকলে, প্রতিটি যুদ্ধে থাকলে জয় বাংলা ত্বরান্বিত হবে। সংসারযুদ্ধে ক্লান্ত মকতু মিয়ার যে জয় বাংলার খুবই দরকার। জয় বাংলা হলে তার সব অভাব ঘুচে যাবে। শান্তি ফিরে আসবে তার সংসারে। মকতু যুদ্ধের পর কিছুদিন হাটে-বাজারে ওষুধ ফেরি করেছে। এখন শনির আখড়ায় ভিক্ষা করে। চোখে দেখে না, প্রায় অন্ধই হয়ে গেছে।

জিপগাড়িটি আটকাতে হবে

প্রতিদিন ভোর ভোর সময়ে একটি জিপগাড়ি পঞ্চগড় থেকে অমরখানা ঘাঁটিতে যায়। তাতে থাকে রেশন সামগ্রী, গোলাবারুদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। রাতের যুদ্ধে

আহত-নিহত সৈনিকদের নিয়ে জিপটি আবার ফিরে যায় পঞ্চগড় গ্যারিসনে। গাড়িটা ধরতে হবে, এই মিশন নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি চৈতন্যপাড়ায় পাকা সড়কের পাশে। জগদলহাট, অমরখানা পাকিস্তানি ঘাঁটির মাঝামাঝি জায়গায় এটির অবস্থান। শত্রুপুরীর মাঝামাঝি, খুবই 'বিপজ্জনক এলাকা। চিহ্নিত হয়ে গেলে পুরো দলই একেবারে শেষ হয়ে যাবে। উপায় নেই, জিপগাড়িটি ধরতে হলে এমন কৌশলগত সুবিধাজনক জায়গা ধারে কাছে আর কোথাও নেই।

সন্ধ্যায় মুষলধারে বৃষ্টির আবরণ নিয়ে আমরা এখানে পৌঁছেছি। দলকে তিন ভাগে বিন্যাস করে পাকা সড়কের ধারে পজিশন নিয়েছি পরিত্যক্ত বাড়িঘরগুলোর পেছনে বাড়ন্ত কচুগাছ, বুনো ঘাস আর ঝোপঝারের ভেতর। কাছেই একটা কাঁচা ল্যাট্রিন। বর্ষার পানিতে ময়লা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। দুর্গন্ধে নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে আসতে চায়। উপায় নেই, এ অবস্থান ছাড়া যাবে না। সকালে পাকিস্তানি সেনাদের জিপগাড়িটি আসবে, সেটা আটক করতে হবে। বৃষ্টির বেগ বেড়ে চলে, মনে হয় আকাশ থেকে বালতি বালতি পানি ঢালছে কেউ। সারা শরীর ভিজে চলেছে, কাদাপানিতে সবকিছু সয়লাব। শরীরজুড়ে হিম ঠান্ডা, এর মধ্যে দাঁতে দাঁত চেপে গাড়ি ধরার লক্ষ্যটা সামনে রেখে অদম্য জেদ নিয়ে সবাই মিলে রাইফেল, এলএমজি তাক করে শুয়ে থাকি।

একসময় ভোর হয়, পেছনে খসখসে আওয়াজ। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসে এক লোক। মধ্যবয়সী, হালকা-পাতলা গড়নের মানুষ। বলে, 'আমার নাম হজরত আলী, খানসেনাদের অত্যাচারে বাড়িঘর ছাড়ি দিছি, আপনাদের খবর পেয়ে আসলাম। কহেন কী করিবা হবে? বলি, ছেলেদের জন্য কিছু খাবার জোগাড় করতে পারবেন? 'বাড়িতে তো পরিবার পরিজন কেহ নাই, দেখি কী করিবা পারি।' বলে হজরত আলী চলে যায়। কিছুক্ষণ পর সে গামছায় করে সের খানেক চাল ভাজা নিয়ে আসে, সঙ্গে লবণ। সেই চাল ভাজা সবাইকে মুঠি মুঠি করে দেওয়া হয়। হজরত আলীকে বলি, এই বিপদের মধ্যে আপনি কষ্ট করলেন? 'কষ্ট আর কী, তুমরা যুদ্ধ করেছেন, জয় বাংলা কী হামার লাগিবে নাই।' ওর উত্তর। তাই তো হজরতেরও জয় বাংলা লাগবে। স্বাধীনতা লাগবে। জানি না, এই অপারেশন শেষে আমরা চলে গেলে হজরত আর তার বাড়িঘরের কী হাল করবে পাকিস্তানি হায়েনার পাল। কিন্তু তাতে কী? এই যুদ্ধের একজন শরিকদার হয়ে সে থেকে যায় আমাদের সঙ্গে।

অপেক্ষার পালা শেষ হয়। প্রথমে ভোঁ শব্দ, তারপর গাড়ি। সামনে একরামুলের দল ফায়ার ওপেন করে, সেই সঙ্গে পেছনে সামসুদ্দিনও। গাড়ি আটকে যায়। 'চার্জ', বলে সবাইকে নিয়ে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে যাই। পাকিস্তানি সেনারা পাল্টা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে। ধমাধম গ্রেনেড ছুটে যায় গাড়ির দিকে। বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ ওদের থামিয়ে দেয়। গাড়ি আমাদের দখলে এসে যায়। ড্রাইভারসহ তিনজন খানসেনা নিহত, একজন আহত অবস্থায় পালিয়ে গেছে। ওদের হাতিয়ারপত্র, গোলাবারুদ আমাদের দখলে আসে। এরপর চার্জ লাগিয়ে আমরা সরে পড়ি। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। গাড়ি উড়ে যায়। হজরত আলী হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, 'শাবাশ বাবাজিরা! এবার

হামার জয় বাংলা কে আটকাতে পারে দেখি!' তাকে সাবধানে থাকতে বলে ক্লান্ত পায়ে আমরা নিজেদের আশ্রয়ে ফিরে আসি। একেবারে বাঘের গুহার মুখে বসে হজরত আলীর সেদিনের সাহস আর সাহায্যের কথা ভোলা যায় না। দেশ স্বাধীন হওয়ার বেশ কিছুদিন পর হজরত আলীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কেমন বুড়িয়ে গেছে, বাড়িঘরের জীর্ণ দশা। না, সে আমাদের কাছে কিছু চায়নি, শুধু বলেছে, 'আসবেন মাঝেমধ্যে, সেদিন সবাই কষ্ট করেছি বলেই না দেশ আজ স্বাধীন।'

কহেন তো জয়বাংলা কবে হবে?

এ জেলারই গুয়াবাড়ির জোনাব আলীকে খুব দরকার। আজকের রাতের অপারেশনে সে আমাদের গাইড। তার বাবা বললেন, 'সে তো বাড়িতে নাই।' কোথায় পাওয়া যাবে, জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেন, 'খানে গো ভয়ে কোথায় থাকে, লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়ায়, থাকনের ঠিক নাই, খাওনের ঠিক নাই, একেবারে শিয়াল-কুত্তার জীবনযাপন এখন জোনাব আলীর।' চারদিকের অবস্থা ভালো নয়। পাকিস্তানি সেনারা নিয়মিত টহল দিচ্ছে। একে ধরে, ওকে মারে, সন্দেহভাজনদের ধরে নিয়ে যায়, তাদের মধ্যে কেউ ফেরে, কেউ ফেরে না। হাঁস-মুরগি, গরু-বকরি নিয়ে যায়। মেয়েদের খোঁজে। কী দিনকাল! অন্যদিকে অভাবের করাল গ্রাস। গৃহস্থ পরিবার, বাড়িঘর ফেলে ভারতে শরণার্থীও হয়ে যাওয়া যায় না। জোনাব আলী মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কাজ করে বলে সে শত্রুদের কাছে চিহ্নিত হয়ে পড়েছে, ধরা পড়লেই বিপদ। এদিকে অভাবের করাল গ্রাস। হাটবাজার বন্ধ, জরুরি ক্রয় বিক্রয় করতে হলে যেতে হয় শত্রুকবলিত এলাকাগুলোয়। জোনাব আলীর বাড়িতে থেকে সংসার দেখাশোনা করতে পারে না। ভেঙে পড়া মানুষের মতো জোনাব আলীর বাবা দুঃখের পাঁচালি গেয়ে যান। হতাশা ভরা কণ্ঠে তিনি জানতে চান, 'বাবারা, তুমরা তো যুদ্ধ করোছেন, কহেন দি, কবে জয় বাংলা হবে?'

কবে জয় বাংলা হবে, সে তো আমরাও জানি না; আদৌ হবে কি না, তাও বলতে পারি না। সীমিত শক্তি আর অস্ত্রবল নিয়ে আমাদের গেরিলাযুদ্ধ। রাতের অন্ধকারে ভূতের মতো চলাফেরা। আচম্বিতে শত্রুঘাঁটিতে আঘাত করে পালিয়ে আসা, যেটাকে বলে হিট অ্যান্ড রান। এই করে একটি নিয়মিত দুর্ধর্ষ শত্রুসেনা দলকে পরাজিত করা সে তো অলীক স্বপ্নের মতো। সময় লাগবে, অনেক সময়, শক্তি আর অস্ত্রবল লাগবে অনেক বেশি। এখন চলছে শত্রুকে পেছন থেকে আঘাতের পর আঘাত করে তাদের দুর্বল করে দেওয়ার কৌশল। তারপর একদিন সম্মিলিতভাবে চূড়ান্ত হানা হবে। তখন তাদের সব প্রতিরোধ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। তার জন্য সময় আর প্রস্তুতি নিতে হবে। কিন্তু অসহায়, ভেঙে পড়া মানুষ এখনই জয় বাংলা চায়।

তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। বাইরের চত্বরে বসে আমরা বৃদ্ধের কথা শুনি আর পরিশ্রান্ত শরীরকে বিশ্রাম দিই। এমন সময় একটি ছেলে এসে বলে, 'আপনাকে ভাবি ডাকে।' ভাবি মানে? জোনাব আলী ভাইয়ের স্ত্রী। ছেলেটার সঙ্গে অন্দরমহলে যাই। এ ঘর-ওঘরের পাশ দিয়ে সে নিয়ে গিয়ে হাজির হয় একেবারে রান্নাঘরে। কম বয়সী এক

রমণী, আগুনের মতো চেহারা তার, চুলোর আলোয় বড় স্পষ্ট করে দেখা যায় তার রূপের আভা। কিছুটা ধাক্কা খেতে হয়। মনে হয়, কেন জোনাব আলী মহিলাকে অরক্ষিত অবস্থায় বাড়িতে রেখেছে? খানসেনারা জানতে পারলে যেকোনো সময় বিপদ ঘটবে। মহিলা বলেন, 'চা-নাশতা হচ্ছে, খেয়ে যাবেন।' বলি, আবার চা-নাশতা কেন? এমনিতেই তো আপনাদের দিনকাল ভালো যাচ্ছে না। 'তাতে কী হইছে, আপনারা ক্লান্ত হয়ে এসেছেন।' বলি, এ জন্যেই ডেকেছিলেন? 'না, তেনার খবর আছে। মানুষটার শান্তি নাই, সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে, খালি আমাকেই জানাইয়া যায় তার ঠিকানা, মুক্তিরা আইলে আমি যেন তাগো জানাইতে পারি।' কী বলে মহিলা? কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে যাই। আমাদের অন্তঃপুরের মেয়েরা কীভাবে নিজেদের তৈরি করেছে! আসার সময় মহিলা জোনাব আলীর ঠিকানা জানায় আর বলেন, 'আমাদের খুব তাড়াতাড়ি জয় বাংলা লাগবে, এটা যেমন করি হোক আপনারা করি দ্যান।'

ফিরে আসি দহলিজে। চা-নাশতা আসে। সুস্বাদু চিড়া ভাজা আর গুড়ের চা। খেতে খেতে ভাবি, ঘরের ভেতরে-বাইরে নারী-পুরুষ তৈরি হচ্ছে। এভাবে চললে জয় বাংলা হতে কি আর বেশি দিন লাগবে? লাগবে না। তিন যুগ পর মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সংসারে দারিদ্র্যের আঘাত, চেহারা-শরীর ভেঙে গেছে। কিন্তু সেদিনের মতোই বলে ওঠেন, জয় বাংলা তো হলো, কিন্তু এত দিন পর দেখতে এলেন? তার কথার কোনো উত্তর দেওয়া যায় না।

ধনা দাস লোকজন নিয়ে রাস্তার মুখে পাহারা বসিয়েছে। সদর থানার হিন্দুপাড়া বারাথান। এ এলাকায় একটিই হিন্দুপাড়া। এ জন্য পাকিস্তানি সেনাদের অন্যতম টার্গেট এটা। পরিবার-পরিজন সব ভারতে, শরণার্থীশিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধনা দাসের নেতৃত্বে কয়েকজন পুরুষ রয়ে গেছে পাহারায়। বাড়িঘর পরিত্যক্ত অবস্থায় ছেড়ে গেলে কিছুই থাকবে না, দুই দিনেই সব লুটপাট করে নিয়ে যাবে সুযোগসন্ধানী মানুষ। বর্বর পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল বর্ডার পর্যন্ত এসে গেছে। যেকোনো সময় বারাথান গ্রাম আক্রান্ত হতে পারে। পাশাপাশি শুরু হয়েছে ডাকাতের উৎপাত। জনজীবনে শান্তি-স্বস্তি কিছুই নেই। হিন্দুপাড়ায় শঙ্কা আর ভয় অনেক বেশি।

মধ্যরাতে মুক্তিযোদ্ধাদের দলটিকে ধনা দাস তার দলবল নিয়ে আটকে দেয়। হাতে দা, লাঠি, তীর ধনুক, বল্লমজাতীয় অস্ত্র। সেই অস্ত্র হাতে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের চ্যালেঞ্জ করে বসে। মুক্তিযোদ্ধারা হাতিয়ার হাতে খটাখাট তৈরি। না, গোলাগুলি রক্তপাত হয় না। মুক্তিফৌজ পরিচয় পেয়ে ধনা দাস তাদের সাদরে গ্রহণ করে এবং বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানেই গড়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের হাইডআউট। ধনা দাস সব সময় আশপাশে থাকে, হাতিয়ারপত্র দেখে। শত কৌতূহল তার চোখে-মুখে। মুক্তিরা আসায় তার মনে হয়, জয় বাংলা বুঝি হয়েই গেল। নির্দিষ্ট অপারেশন শেষে বারাথান গ্রাম ছেড়ে আসার সময় ধনা দাসের কণ্ঠে হাহাকার, 'তুমরা চলে যাছেন, তাইলে আমাদের জয় বাংলা কি হবে না?' স্বাধীন দেশে ধনা দাসের সঙ্গে দেখা হলে জলমলে কণ্ঠে সে বলেছিল, 'জয় বাংলা তো হইছে, স্বাধীন দ্যাশ, এখন তো আমাদের সব দুঃখ-কষ্টের শেষ হবে, কোনো

অন্যায়-অবিচার আর থাকবে না। কী কহেন? ধনা দাসের বিশ্বাস ভাঙতে ইচ্ছে করে না। বলি, তা-ই হবে ধনা দাস।

জালিমদের হাত থেকে বাঁচান

সর্দারপাড়ার হালিম মাস্টার যুদ্ধের আগে কাউন্সিল মুসলিম লীগের সমর্থক ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হলো। পাকিস্তানি সেনাদের বর্বরতা-নৃশংসতা দেখে তিনি জয় বাংলার পক্ষে চলে আসেন। যোগাযোগ করেন মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া যুবক ছেলেদের বাঁচাতে হবে। তাঁর গ্রামকে রক্ষা করতে হবে। পাকিস্তানি সেনাদের নিয়মিত টহল বন্ধ করতে হবে। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক আবদুল হালিম তাই বড় ধরনের ঝুঁকি নেন। আমাদের সঙ্গে দেখা করে বলেন, 'বাবা, ওই জালিমদের হাত থেকে বাঁচান। আপনারা আমাদের গ্রাম আক্রমণ করেন। আমার বাড়িঘর উড়িয়ে দেন, ছেলেদের নিয়ে যান। আমরা পাকিস্তানি সেনাদের বলতে পারব, মুক্তিযোদ্ধারা এসে হামলা করে গেছে আপনাদের সমর্থন দেওয়ার কারণে।' ওরা ভয় পেয়ে যাবে, আর আসবে না এদিকে। সেভাবেই নকল যুদ্ধ সাজানো হয়, কিন্তু সত্যি-সত্যি মাস্টার সাহেবের দো-মহলা বাড়ি চার্জ লাগিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়। ছেলেরা চলে আসে আমাদের দলে। হালিম মাস্টার সেভাবেই গল্প ফাঁদেন পাকিস্তানি সেনাদের কাছে। ওরা আর সর্দারপাড়ার পথ মাড়ায় না। হালিম মাস্টার এভাবেই আমাদের সাহায্য করেন বিস্তীর্ণ একটা জনপদ মুক্ত রাখতে। যুদ্ধের পর হালিম মাস্টার তাঁর বাড়ি ঘর ঠিক করতে পারেন নি। এ নিয়ে তাঁর হতাশা নেই। বলেন, জালিমদের হাত থেকে তো দেশটা রক্ষা পেয়েছে।

পঞ্চগড় সদরের পানিমাছ শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করা হবে। রাজ্জাক মাস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। তাঁর গ্রাম পার হলেই শত্রুর শক্ত ঘাঁটি পানিমাছ। সেখানে যেতে হলে স্থানীয় মানুষের সাহায্য প্রয়োজন। রাজ্জাক মাস্টার সেই মানুষ। এক আঁধারকালো রাতে তিনি শত্রুঘাঁটির কাছাকাছি এক কৌশলগত অবস্থানে আমাদের পৌঁছে দেন। মধ্যরাতে শুরু হলো ভয়াবহ যুদ্ধ। শেষরাতে আমরা ফল ব্যাক করি। পরদিনই পাকিস্তানি সেনারা এসে রাজ্জাক মাস্টারের গ্রামটা জ্বালিয়ে দেয়। পরিবার-পরিজন নিয়ে রাজ্জাক মাস্টারসহ অন্যরা আশ্রয় নেন ভারতের বেরুবাড়ী শরণার্থী ক্যাম্পে। একদিন দেখা হয়ে যায় তাঁর সঙ্গে বেরুবাড়ী বাজারে। কেমন শীর্ণ মলিন হয়ে গেছেন, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। নিজেদের কেমন অপরাধী লাগে তাঁর সামনে। মনে হয়, আমরা পানিমাছ ডিফেন্স আক্রমণ না করলে পাকিস্তানি বাহিনী প্রতিহিংসার বশে এঁদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিত না। শরণার্থী হয়ে ভিন দেশে এই হীনম্মন্যতার জীবন যাপন করতে হতো না তাদের। কিন্তু অবাক হয়ে শুনতে হয়, 'আমাদের ঘরবাড়ি গেছে তো কী হয়েছে, ওদের তো হটানো গেছে। আবার যদি ওরা আসে পানিমাছে, আবার যাব, ব্যাটাদের খতম করে দিয়ে আসব। মনে মনে বলি, এই রাজ্জাক মাস্টাররা আছেন বলেই তো আমরা যুদ্ধ করছি। তাঁর জয় বাংলা প্রয়োজন। জয় বাংলার নাগাল তাঁকে যে করেই হোক পেতে হবে।

পালান এই দিক দিয়া

পিন্টুসহ ১০ জন যুদ্ধ শেষে ঝুম বৃষ্টির মধ্যে সদর থানার ভিতরগড়ে মতিনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। মতিন ওর বউ-বাচ্চা সরিয়ে নিয়ে শোবার ঘরটা পিন্টুদের জন্য ছেড়ে দিয়েছে। গভীর ঘুমে নিমগ্ন পিন্টুদের ঘুম ভেঙে যায় ধাক্কাধাক্কিতে। মতিনের বাবা বলেন, 'সর্বনাশ হয়েছে, খানসেনারা বাড়ি ঘেরাও করেছে, এক্ষুনি ভেতরে ঢুকে পড়বে, আপনারা পালান।' পিন্টুরা কিছু বুঝে উঠতে পারে না—কী করবে, কোন দিকে যাবে এমন সময় মতিনের মা আর বউ এসে তাঁদের শরীরে শাড়ি পেঁচিয়ে দিয়ে যেন ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যান। পাতকুয়ার পাশ দিয়ে পেছনের আখখেতে ঢুকিয়ে দিয়ে বলেন, পালান এই দিক দিয়ে। পাকিস্তানি সেনারা পিন্টুদের খুঁজে পায় না, গুলি করে মারে মতিনের দুই ভাইকে, পুরো বাড়িতে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়।

মুক্তিযুদ্ধ মানে সাধারণ মানুষের মুখ, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সম্পৃক্ততা। জনযুদ্ধের স্বরূপ তো এমনই। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। শত মানুষ এভাবে এগিয়ে এসেছে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে। প্রবল ঘৃণা ছিল তাদের পাকিস্তানি সেনাদের প্রতি, যারা দেশটা জবরদখল করে অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছিল। পরাভূত করে রাখছিল জয় বাংলার চির লালিত স্বপ্ন। ফলে সুযোগ পেলেই মানুষ এগিয়ে এসেছে, কি পুরুষ কি নারী। তাদের তেমন চাওয়া-পাওয়া ছিল না। ছিল আশাজাগানিয়া স্বপ্ন। দেশটা স্বাধীন হবে, স্বাধীন দেশে মুক্ত মানুষ হয়ে তারা ইচ্ছাখুশিমতো বাস করবে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা এত বেশি ছিল, যা কোনো দিনই বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। এখানে মাত্র কয়েকটি ঘটনা বিধৃত করে জনসম্পৃক্ততার গভীরতা বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। এমন হাজারো ঘটনা রয়েছে দেশজুড়ে।

এখন কেমন আছেন তাঁরা

কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী থেকে মুক্তিযুদ্ধে এসেছিল নুরুউদ্দিন। বেশকিছু ভয়াবহ যুদ্ধে অংশ নেয় সে। সাহসী টগবগে সদ্য তারুণ্য পার হয়ে আসা যুবক। যুদ্ধ শেষে এটা-ওটা করে কিছুই ধরে রাখতে পারে না। চলে যায় দুর্গম পার্বত্য এলাকা বান্দরবান। বাঁশ কাটে, শন কাটে পাহাড় থেকে, বাজারে বিক্রি করে। তাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দেওয়া হয় নিজ উপজেলা নাগেশ্বরীতে। তার ছেলেমেয়েদের সাধ্য অনুযায়ী পড়াশোনা করায়। সদ্য অস্থিরতায় ভোগা নুরুউদ্দিন মনে শান্তি পায় না। কী হলো তার জয় বাংলার যুদ্ধে গিয়ে? স্বাধীন দেশ তো আমাদের কিছু দিল না। আমার সন্তানদের কী হবে?

রংপুরের মুহিপুর গ্রামের হাসানের মেরুদণ্ডে গুলি লাগে, করতোয়াপারের কালিয়াগঞ্জের যুদ্ধে। তুমুল যুদ্ধ আর গোলাগুলির তাণ্ডবের মধ্যে তাকে উদ্ধার করা হয় অনেক ঝুঁকি নিয়ে। দ্রুত পাঠিয়ে দেওয়া হয় সিএমএইচে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সুস্থ হয়ে দেশে ফেরে। তার কাছে জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তাদের দেখতে গিয়েছিলেন। জামাকাপড়, টাকা, বিস্কুট, সাবান—এগুলো উপহার দিয়েছিলেন। হাসানের ভাগ্যে আর কিছুই জোটে না। 'ভাইজান, মোক এখনা চাকরি দ্যান।' দেখা

হলেই বলে। এরশাদের আমল তখন, রংপুরে চিড়িয়াখানা হচ্ছে। পিন্টুসহ কয়েকজন মিলে জেলা পশুপালন অফিসারকে এক রকম ঘেরাও করি। বলি, এর নাম হাসান। কালিয়াগঞ্জের যুদ্ধে ওর পিঠে গুলি লেগেছিল। এখনো বুলেট রয়েছে ওর মেরুদণ্ডে। ওকে চাকরি দিতেই হবে। হাসানের দারোয়ানের চাকরি হয়। তার সন্তানদের চাকরির জন্য এখন সে হন্যে হয়ে ঘোরাঘুরি করে।

পঞ্চগড়ের সজিমউদ্দীন মুক্তিযোদ্ধা সঙ্গীদের নিয়ে বদলুপাড়ায় তার নিজ গ্রামে তুলেছিল। কিছু দূরেই বিসমনিতে পাকিস্তানি আর রাজাকার বাহিনীর ঘাঁটি। বিসমনি ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়ায় পাকিস্তানি বাহিনী চড়াও হয় সজিমউদ্দিনের বাড়িতে। মহিলাদের নির্যাতন করে। জ্বালিয়ে দেয় সজিমউদ্দীনের বাড়িসহ পুরো গ্রাম। বড় অপমান সইতে হয়েছে সজিমউদ্দীনকে। বড় মূল্য দিতে হয়েছে তার পরিবারকে। স্বাধীনতার পর তার কোথাও যাওয়া হয় না। সংসারের অনটনে জমি বেচতে থাকে এবং প্রায় পথের ভিখারি হয়ে যায়। কয়েক বছর আগে কিছু জমি উদ্ধার করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাকি সব জমি ফেরত চাই। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা সে। কেনো স্বাধীন দেশে এত দিন পার হওয়ার পরও তার জমি উদ্ধার হবে না? তার দাবির কথা ঠিক। কিন্তু শুনে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই।

আব্বাস ছিল লালমনিরহাটের হাতিবান্ধার কাকিনার লোক। মধুপাড়ার যুদ্ধে সে মারা গেল। কলেজে পড়ত সে, ফার্স্ট ইয়ারে। যুদ্ধে যাওয়ার এক মাস আগে বিয়ে করেছিল। নতুন বউ ছেড়ে চলে গিয়েছিল যুদ্ধে। মধুপাড়ার যুদ্ধে বুকে গুলি লেগে সে মারাই গেল। ওর ঠিকানা যুদ্ধের ডামাডোলে হারিয়ে গিয়েছিল। হাতিবান্ধার কাকিনার কাছে কোনো এক গ্রামে অপেক্ষারত তার স্ত্রীকে আমরা ওর মৃত্যুর খরব পৌঁছাতে পারিনি। জানি না, পরে সেদিনের সেই নতুন বউয়ের কী হাল হয়েছে।

জহিরুল ছিল পঞ্চগড় স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। যুদ্ধের ডাকে সে চলে যায় ফ্রন্টে। অমরখানার যুদ্ধে দুজন রাজাকার পাকড়াও করা হয়েছিল। তাদের পাহারাদারিতে ছিল ভজনপুরের ছেলে মতিয়ার আর পঞ্চগড়ের জহিরুল। রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি বাহিনীর কাউন্টার অ্যাটাকে মতিয়ার নিহত হয়, প্রচণ্ডভাবে আহত জহিরুল মৃতবৎ পড়ে থাকে। তাদের উদ্ধার করে আনা হয়েছিল অতিকষ্টে। জহিরুলকে পাঠানো হয় হাসপাতালে আর মৃত মতিয়ারকে কবর দেওয়া হয় পাকা রাস্তার ধারে। কেউই যায় না এখন মতিয়ারের কবরের কাছে, নিতান্তই অবহেলিত শহীদ মতিয়ার। আর পুরো শরীরে যুদ্ধের ক্ষত নিয়ে জহিরুল ঘুরে বেড়ায় মুক্তিযোদ্ধা-ভাতার জন্য।

বেপরোয়া সাহস আর ঝুঁকি নিয়ে টোকাপাড়া ক্যাম্প রক্ষার সংকল্প নিয়েছিল গোলাম গউস। তার বাড়ি রংপুর। এককভাবে অগ্রসরমান শত্রুসেনা দলকে থামানোর লক্ষ্যে সম্মুখযুদ্ধে শহীদ হয় গোলাম গউস। এই বীরত্বের জন্য কোনো স্বীকৃতি নেই,নেই কোনো পদক। তার কবর পড়েছে ভারতীয় ভূখণ্ডে, সেখানে যাওয়ারও কোনো উপায় নেই।

রংপুরের সেই বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা পিন্টুর এখনো বাড়িঘর হয়নি। প্রাইভেটে

কোম্পানির চাকরি করে কায়ক্লেশে সংসার চলে। তার জিজ্ঞাসা, আমি মারা গেলে বউ-বাচ্চা থাকবে কোথায়? দুর্ধর্ষ যোদ্ধা কোম্পানি কমান্ডার পিন্টুর প্রশ্নের কোনো জবাব দেওয়া যায় না।

অমরখানা যুদ্ধের নায়ক নাগেশ্বরীর বীর মুক্তিযোদ্ধা বসারত। বেসরকারি এক প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করে সে। তাতে সংসার চলে না। অভিমানহত বসারত এখন আর কোনো অনুযোগ করে না।

বদরগঞ্জের খলীল, শালমারা যুদ্ধের সেই সাহসী যোদ্ধা। যুদ্ধের পর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ডিড রাইটারের কাজ করত। কয়েক বছর আগে মারা গেছে। তার বড় ছেলে ঢাকায় রিকশা চালায়, ছোটটার কোথাও চাকরি হয় না। তার স্ত্রী রংপুর মেডিকেলে চিকিৎসা নেন আর বেঁচে থাকার সংগ্রাম করে চলেন।

জনযুদ্ধের গণনায়কেরা

দুর্ধর্ষ যোদ্ধা মতিয়ার, বাবলু, খলিল, মালেক, মঞ্জু, মোতালেব, হাদী, মূসা, ইব্রাহিম, একরামুল, তবিবর, জব্বার, হাকিম, আখতার, আবু বকর, শামসুল, হাফেজ, সফিউদ্দিন, পহর আলী, মজিদ, চাঁদ মিয়া, শম্ভু, ভরত, অশ্বিনী, সামসুদ্দিন, জয়নালসহ অন্যান্য সাহসী যোদ্ধা জীবন-সংসার নিয়ে ব্যস্ত। মরে মরে বেঁচে থাকা এসব জনযোদ্ধা এখনো নিজেদের মধ্যে ধরে রেখেছে সেই অহংবোধ। তারা জয় বাংলার জন্য যুদ্ধ করেছে। তারা মুক্তিযোদ্ধা, তাদের জন্যই এই দেশ।

দুর্ধর্ষ যোদ্ধা শাহাজাহান নাগেশ্বরীতে প্যারালাইসড হয়ে পঙ্গু জীবন যাপন করছে। মোসারেদ পাগলা অভাবের তাড়নায় গাছের সঙ্গে ফাঁস লাগাবে বলে দড়ি হাতে ছুটে যায়। গাধা কমান্ডার রউফ এখন কেমন কুজো হয়ে চলাফেরা করে। আজিজুল রংপুর শহরে তেল বেচে বলে তার নাম হয়ে গেছে তেলী আজিজুল। তারও সংসার চলে না। ভূত দেখা বাচ্চা মিয়া রেলের চাকরি করে। চাকরির বয়স শেষ হয়ে এল, ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে ঘোরে চাকরির খোঁজে। এভাবে যুদ্ধদিনের ছেলেরা, যারা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসেবে দারুণ খ্যাতি অর্জন করেছিল, তারা আসে আমার কাছে। আমি তাদের যুদ্ধদিনের কমান্ডার, তাই এখনো কমান্ডার।

এরা কেউই সেনাবাহিনী থেকে আসেনি, ইপিআর থেকে আসেনি, অন্য কোনো সশস্ত্র বাহিনী থেকেও নয়। এরা অন্ধ আবেগে সীমান্ত পাড়ি দিয়েছে। এদের বুকের মধ্যে শুধু কাজ করছে জয় বাংলা আর জয় বঙ্গবন্ধু। এরা মুক্তিফৌজে নাম লিখিয়েছে, প্রশিক্ষণ নিয়েছে, তারপর থেকেছে যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে। যুদ্ধের নায়ক এরা, এরা সব সূর্যসন্তান। কিন্তু যুদ্ধের পর সবার যেন কেমন কদর কমে গেল। কেমন করুণার পাত্র বনে গেল সবাই। অথচ কজনই বা ছিল সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা? এক লাখ, দেড় লাখ? এদের কি পুলিশ, আর্মি, বিডিআর, কল-কারখানায় প্রশাসনের চাকরি দিয়ে পুনর্বাসন করা যেত না? যেত। কিন্তু সেটা আমরা করিনি। কেন করিনি?

জনযুদ্ধের স্বরূপ হচ্ছে, জনগণের মধ্যে থেকে জনগণকে দিয়ে যুদ্ধ করা। ভিয়েৎনাম যুদ্ধের কমান্ডার জেনারেল গিয়াপের তত্ত্ব এটি। কজন আর সেনাসদস্য বা

ইপিআর ছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে? কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক—এদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী। নিম্নবর্গ মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী এই যোদ্ধা দল স্বাভাবিকভাবেই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পেয়েছিল। জনগণ আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে, পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে শত্রুর অবস্থানের দিকে। এমনকি যখন অলআউট যুদ্ধ শুরু হয়, সব ফ্রন্ট দিয়ে মিত্রবাহিনী এগোতে থাকে, তখন এই জনগণই তাদের সাদরে গ্রহণ করেছে, শত্রুর অবস্থান চিনিয়ে দিয়েছে, সঙ্গী হয়েছে অগ্রসরমাণ যোদ্ধাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমেই নয় মাসের যুদ্ধে অর্জিত হয়েছে বিজয়। বাংলাদেশের জনযুদ্ধের ব্যাপারটি এক ব্যতিক্রমী অসাধারণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হবে আমাদের ইতিহাসে। মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে গেলে অবশ্যই সর্বাগ্রে বলতে হবে তাদের কথা। আমাদের যুদ্ধের নায়ক সেই সাধারণ জনগণের কথা।

মাহবুব আলম

জন্ম : ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫০, রংপুর। শিক্ষা : রংপুর জেলা স্কুল এবং কারমাইকেল কলেজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে এম এ। পোল্যাণ্ডের ওয়ে রসো ইউনিভার্সিটি জনপ্রশাসনে এমএস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন মুক্তিযুদ্ধে যোগদান। ৬ নম্বর সেক্টরের ৬/এ সাব-সেক্টরে স্কোয়াড্রন লীডার সদরুদ্দিনের অধীনে পঞ্চগড় এলাকায় যুদ্ধ। প্রকাশিত গ্রন্থ–গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে (দুই খণ্ড), স্মৃতিসৌধ, এইদিন সেইদিন, এখন বড় অসময়, হাইড আউটের গল্প, যুদ্ধরেখা প্রমুখ।

জনযুদ্ধের গণযোদ্ধারা

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

আপাতদৃষ্টে দুর্ভাগ্য মনে হলেও আদতে জনযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারা যেকোনো জাতির জন্য এক পরম সৌভাগ্যের ঘটনা। জনযুদ্ধ সংঘটনের সময়ে আপামর জনগণকে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করে এবং অবর্ণনীয় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। একাত্তরে যে জনযুদ্ধ বাঙালি জাতি করেছে, তা অপেক্ষাকৃত স্বল্পমেয়াদি হলেও এটাই ছিল প্রকৃত জনযুদ্ধের বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। আমাদের সর্বস্তরের মানুষ একই সমতটে এসে জড়ো হয়েছিল একই ঈপ্সিত লক্ষ্যে।

জনযুদ্ধের যোদ্ধাদের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়—নাগরিক যোদ্ধা, অনিয়মিত সৈনিক, গেরিলা যোদ্ধা। এরা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আসা সাধারণ মানুষ, নিয়মিত বা প্রচলিত সৈনিক নয়। আমরা তাদেরকে বলি গণযোদ্ধা। এরা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, নৌকার মাঝি, গেরস্ত ঘরের কামলা, ট্রাক ড্রাইভার, মোটরসাইকেল মেকানিক, কদাচিৎ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এদের বেশির ভাগই জানত, দেশ স্বাধীন হলে এরা কেউ সেনাবাহিনীতে জেনারেল, সরকারের সচিব বা কোটিপতি ব্যবসায়ী হতে পারবে না। এদের তখন যেমন বছরের খোরাক জুটতো না দেশ স্বাধীন হলেও জুটবে না। এরা যুদ্ধে শহীদ হলেও এদের সন্তানদের গৃহস্তের দয়া আর দাক্ষিণ্যেই থাকতে হবে। এই অতি সাধারণরাই অসাধারণ গুণাবলি প্রদর্শন করেছে। কলমের কাজ অস্ত্র দিয়ে হয় না, তেমনি তার উল্টোটাও সত্য।

সামগ্রিক অর্থে এই গণযোদ্ধারাই আমাদের জনযুদ্ধের নায়ক। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ১, ২, ৩, ৪ এবং ৮ এই পাঁচটি ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন ছিল। ১০ অক্টোবর ১৯৭১ নাগাদ, ৯, ১০, ১১ আরও তিনটি ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ান গঠন করা হয় কিছু পুরনো সৈনিক এবং গণযোদ্ধাদের ছয় সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দিয়ে। মোদ্দাকথা এই সৈনিকদের সংগঠন ছিল, প্রশিক্ষণ ছিল এবং অভিজ্ঞতা ছিল। সে অর্থে গণযোদ্ধাদের তেমন কিছুই ছিলনা। প্রথাগত এ ব্যাটালিয়ানগুলোর আবাস ছিল ভারতীয় সীমান্তের ভিতর। কাজেই তাদের আবাস ছিল নিরাপদ চিকিৎসা ও খাবার ছিল নিশ্চিত। গণযোদ্ধারা থাকতো দেশের ভিতর অরক্ষিত হাইডআউটে অর্থাৎ অন্যের বাড়িতে। তাদের খাবার বিশেষ করে চিকিৎসা ছিল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ব্যাটালিয়ানগুলো যুদ্ধ করত সীমান্ত এলাকায় (কামালপুর নকশী, সলদানদী, বিলোনিয়া ইত্যাদি)।

২ নম্বর সেক্টরের সদর দপ্তর মেলাঘরে ক্যাপ্টেন হায়দার কথাচ্ছলে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র ফতেহ আলী চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালোবাসো কাকে?

-নিজকে।

-তাহলে মুক্তিযুদ্ধে এসেছ কেন?

-দেশের জন্য নিজের প্রাণটা দেওয়ার জন্য।

অপ্রচলিত যুদ্ধ (রেইড, অ্যাম্বুশ) হলেও গণযোদ্ধারা যুদ্ধ করতো বাংলাদেশের ভিতরে, সবসময় আতঙ্কে। তাদের প্রচলিত সৈনিকদের মতো বাড়তি সৈন্যের সাহায্যের (রিইনফোর্সমেন্ট) গুলি সরবরাহের ইত্যাদির সুযোগ ছিল না। তাদের না ছিল বেতার যোগাযোগ, না ছিল কোনো আর্টিলারি ফায়ার সাপোর্ট। তাদের অস্ত্র ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের। এদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের আগে একনলা বন্দুকও দেখেনি। দেশপ্রেমের অপার প্রণোদনায় তারা কানাকড়ির দামে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে।

২.

মোশাররফ হোসেন হারুন। তদানীন্তন ফেনী মহকুমার মুন্সিরহাট থানার ধলিয়া গ্রামে বাড়ি। বাবা এরশাদউল্লা কেরানি। একাত্তরে ফেনী কলেজে বি এ শেষ বর্ষের ছাত্র। মাঝারি উচ্চতার, কিঞ্চিৎ ভারি গড়নের এবং গায়ের রং গাঢ় শ্যামলা। গণযোদ্ধা হলেও সে দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন সৈনিক। আরও অনেক গণযোদ্ধা আছে ব্যাটালিয়নের পাইওনিয়ার প্লাটুনে। মাইন লাগানো, মাইন অপসারণ করা, ব্রিজ ধ্বংস করা, প্রতিরক্ষা প্রতিবন্ধক স্থাপন করা পাইওনিয়ার প্লাটুনের কাজ। এ কাজের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। মাইন এবং বিস্ফোরক শত্রু-মিত্র চেনে না। এ বিপজ্জনক কাজটি গণযোদ্ধারা করে অতি আনন্দ আর উৎসাহের সঙ্গে। কিন্তু তাদের কোনো সামগ্রী নেই। নেই মাইন ডিটেক্টর, প্রডার কিছুই।

৬ নভেম্বর দিবাগত রাতে ফেনীর মাঝামাঝি স্থানে উত্তরে চিতলিয়া ও দক্ষিণে চন্দনার ভেতর দিয়ে মেজর জাফর ইমাম দশম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তাঁর সৈনিকদের নিয়ে অনুপ্রবেশ করেন। শীতের সে রাতে গভীর বর্ষণ ও বজ্রপাত হচ্ছিল। তাঁরা চিতলিয়া, গুতুমা, সলিয়া, ধনিকুণ্ডা, চন্দনা এলাকায় একটি অভূতপূর্ব এবং বিস্ময়কর প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করেন। একটি প্রতিরক্ষা উত্তর দিকে মুখ করে (যেদিকে পাকিস্তানি ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট) অপরটি দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ ফেনীর দিকে মুখ করে (যেদিকে ১৫ বালুচ রেজিমেন্ট)। পাকিস্তানিরা সকল অর্থেই অকার্যকর হয়ে পড়ে। পরাজয় ছাড়া তাদের আর কোনো পথ খোলা ছিল না। ১০ নভেম্বর ১৫ বালুচের একজন ক্যাপ্টেন ৭২ জন সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করে।

মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল তখন শিখরে। এখন দক্ষিণে ফুলগাজী, মুন্সিরহাট, বন্দুয়া হয়ে ফেনী দখল করা। আমাদের হারুন সব সময়, সবকিছুতেই সিরিয়াস। লেখাপড়ায়, নামাজে-কালামে তার বিশেষ মনোযোগ। কাজকর্মে তো বটেই, কথাবার্তায়ও সে সাবধানী। সবই করে সে ভেবেচিন্তে। মন্দ কিছুর জন্য তার জন্মই হয়নি। অযথা বেশি

ঝুঁকি নিতে মানা করে বন্ধুদের। বলে, মরেই যদি যাস, তবে আরেকটা যুদ্ধ করবি কীভাবে?

ফেনীমুখী অগ্রাভিযানের আগে প্রথম কাজ পাকিস্তানের পুঁতে যাওয়া পথের মাইন অপসারণ করা। হারুন তার কমান্ডার গোলাম মুস্তাফাকে বলে, মুতিরহাট হয়ে যখন যাব, তখন একটা মিনিট আমাকে দিয়ো। একটু মাকে দেখে আসব। মুস্তাফা হাসিমুখে সায় দেয়। গ্রামের কাঁচি, খুন্তি দিয়ে মাইন তোলা। প্রায় সবই পি-ii নন-ডিটেক্টেবল অ্যান্টি-পারসোনাল মাইন। সেদিনই (১০ নভেম্বর) চিতলিয়া রেলস্টেশনের লাইনের ওপর বিকট শব্দে একটি মাইন বিস্ফোরিত হয়। রেললাইনের পাথরগুলো গুলির বেগে ছুটে গিয়ে আহত করে সহযোদ্ধা মুস্তফা, শহীদসহ আরও অনেককে। তারা রক্তাক্ত হয়। গিয়ে দেখি হারুন 'মা-রে, অ-মা' চিৎকার দিয়ে চিতিয়ে পড়ে আছে। ডান পায়ের গোড়ালি ওপর থেকে উড়ে গেছে। পায়ের ওপরের অংশের মাংস চিরে ঝুলে আছে। সেদিনই তাকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফিল্ড হসপিটালে ভর্তি করা হয়। ১২ নভেম্বর তাকে স্থানান্তরিত করা হয় মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মিত হাসপাতাল বিশ্রামগঞ্জের বাংলাদেশ হাসপাতালে। হারুনের পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে যায়।

হারুনের নিয়তিতে মায়ের শেষ দর্শন ছিল না। হারুন মারা যায় বহু কষ্টভোগের পর। কবে, আমরা জানি না।

৩.

আখাউড়া-কুমিল্লা রেলপথের প্রায় মাঝামাঝি মন্দবাগ রেলস্টেশন। রেললাইনের পূর্ব দিকে প্রায় সমান্তরাল ভারতীয় সীমান্ত। মন্দবাগ রেলস্টেশনটি রেললাইনের পশ্চিম পাশে। দক্ষিণ-পূর্বে সালদা নদীর পশ্চিম পারে পাকিস্তানিদের প্রতিরক্ষা অবস্থান। রেলস্টেশনে শত্রুর দুর্বল উপস্থিতি মনে হলেও তারা এটিকে প্রায় দুর্গ বানিয়ে রেখেছে। শত্রুর এ অবস্থান আমরা দখল করব। আমাদের আক্রমণ হবে পূর্ব দিক থেকে সামনাসামনি: অক্টোবরের মাঝামাঝি কোনো এক দিন। ভোররাতের আক্রমণ। আক্রমণের একপর্যায়ে আড়াআড়িভাবে রেললাইন অতিক্রম করতে হবে আমাদের। আক্রমণ পরিকল্পনা করেছেন চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন আবদুল গফফার হালদার। চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু সৈনিকও আছে আমাদের সঙ্গে। তবে বেশির ভাগই গণযোদ্ধা। আমরা অনেকেই একে অপরের সঙ্গে পরিচিতও নই।

চলমান আক্রমণের একপর্যায়ে রেললাইনে উঠতেই কে যেন আমার কোমর ধরে পেছনে টেনে ধরল। তখন ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। সামনে থেকে শত্রু বৃষ্টির মতো গুলি করছে। আমি বাধ্য হয়েই দাঁড়িয়ে গেলাম। চেয়ে দেখি, ১৪-১৫ বছরের এক কিশোর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তার নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে গেছে। দুই হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, স্যার একজন ডাক্তার ডাকেন আমি বাঁচব। আমি নিশ্চিত, বাঁচার মতো অবস্থায় নেই ছেলেটি। এ সময় এ স্থানে ডাক্তার পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সামনে থেকে গুলি আসছে অবিশ্রান্ত ধারায়। রেললাইনের ওপর আমার

ক্ষণিক দাঁড়িয়ে থাকা মানে নির্ঘাত গুলিতে মৃত্যু। ছেলেটির হাত দুটি খুলে ফেলতে পারছিলাম না। ১৫-২০ সেকেন্ড এই ভাবাভাবির মধ্যে দেখলাম, ছেলেটির হাত দুটি নিথর হয়ে পড়ে গেল।

আক্রমণ সফল হলো আমাদের। মন্দবাগ রেলস্টেশনে শত্রুর অবস্থান দখল করলাম আমরা। আহত-নিহতদের উদ্ধার করতে গিয়ে দেখলাম, ছেলেটি রাইফেল বুকের নিচে ফেলে দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করে মুখটা ডান দিকে রেখে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। চোখ দুটি বন্ধ। চেহারায় কয়েক মিনিট আগের যন্ত্রণা, কাতরতা নেই। আমি তার গ্রাম্য কচি মুখটার সামনে বসে পড়লাম। অভিমানী মুখটি ভুলতে পারি না আজও। যেন বলছে, আপনি ডাক্তার ডাকলেন না। ডাক্তার এলেই কিন্তু আমি বাঁচতাম।

৪.

৩ ডিসেম্বর। অষ্টম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মৌলভীবাজার মহকুমার ভানুগাছ রেলস্টেশন এলাকায় পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর আক্রমণ করেছে। গোটা বাংলাদেশেই তখন পাকিস্তানিদের অবস্থান নড়বড়ে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নগুলোর চারটি কোম্পানির সঙ্গে গণযোদ্ধাদের সমন্বয়ে আরেকটি কোম্পানি গঠন করা হয়। এ, বি, সি ও ডি কোম্পানিরর পর এটির নাম দেওয়া হয় 'ই' কোম্পানি। পাকিস্তানিরা প্রতিরক্ষা অবস্থান ছেড়ে বিশৃঙ্খলভাবে পালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের যোদ্ধারা তাদের ধাওয়া করছে। এমন সময় ই বা ইকো কোম্পানির এক কিশোর যোদ্ধা লক্ষ করল, ভানুগাছ থানায় তখনো পাকিস্তানি পতাকা উড়ছে। কোথা থেকে সে একটি বাংলাদেশের পতাকা জোগাড় করল কে জানে। কাউকে কিছু না বলে সে লোহার পোল বেয়ে ওপরে উঠল। পাকিস্তানি পতাকাটি নামিয়ে সে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশের পতাকা। ঠিক তখনই পলায়নপর শত্রুর নিরাপত্তায় নিয়োজিত কভারিং ফায়ারের একঝাঁক গুলি এসে লাগল ছেলেটির ওপর। ধপ করে ওপর থেকে পড়ল ছেলেটি। পোল বেয়ে রক্ত পড়ছে, রক্তে মাটি লাল হয়ে যাচ্ছে। সহযোদ্ধারা কয়েক মিনিট যুদ্ধ বন্ধ রেখে ছেলেটিকে চোখের পানিতে অভিবাদন জানাল।

এভাবে কত শিশু, কিশোর, যুবক, পৌঢ়, বৃদ্ধ, নারী রক্ত দিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছে। উড্ডীন লাল-সবুজের পতাকার দিকে তাকিয়ে কত শোক ভুলেছে। পাকিস্তানি ক্রিকেট দল ঢাকা এসেছিল যখন, তখন আমাদের ছেলেমেয়েদের অনেকের গালে পাকিস্তানি পতাকা অঙ্কিত দেখেছি। বুকটা ব্যথা করছিল। সত্যি বুকটা ব্যথা করছিল। আমাদের কষ্ট আমাদের সন্তানেরা বোঝে না কেন?

৫.

একাত্তরের মুন্সিগঞ্জ মহকুমার গজারিয়া থানা এলাকার ওপর দিয়ে ঢাকা-কুমিল্লা চট্টগ্রাম মহাসড়ক। ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল যোগাযোগ বিভিন্ন স্থানে ব্রিজ উড়িয়ে, মাইন পুঁতে, রেললাইন উপড়ে ফেলে এবং উপর্যুপরি অ্যাম্বুশ করার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধারা সম্পূর্ণরূপে

অকার্যকর করে দেয়। ঢাকায় পি আই এর (পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনস) ছোট্ট বিমানবহরের পক্ষে সৈন্য, রসদ ও মালামাল পরিবহন করা অসম্ভব ছিল। কাজেই ঢাকা -কুমিল্লা-চট্টগ্রাম মহাসড়কই ছিল পাকিস্তানিদের চলাচলের একমাত্র পথ। সামরিক ভাষায় যাকে বলে মেইন সাপ্লাই রুট বা প্রধান সরবরাহ সড়ক। কাজেই এ সড়ক নিরাপদ রাখা ছাড়া পাকিস্তানিদের গত্যন্তর ছিল না। কয়েক মাইল দূরে দূরেই ছিল পাকিস্তানিদের ক্যাম্প— বাউসিয়া মেঘনা-গোমতীর পাড়ে, বাউসিয়া ব্রিজে, মেঘনা ফেরিঘাটে, ভবেরচরে এবং ভাটেরচরে। ঢাকার দিকে কাঁচপুর এবং কুমিল্লার দিকে দাউদকান্দিতে ছিল শত্রুর শক্ত উপস্থিতি। তারা গাড়িতে এবং পায়ে হেঁটে গোটা রাস্তায় সার্বক্ষণিক টহল দিত। মেঘনা নদীর পাশের এক গ্রাম ঘেঁষে গেছে জোয়ার-ভাটার খাল। এই গ্রামের তিন মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু নিজ গ্রাম থেকে ক্যাম্পে অবস্থানরত সহযোদ্ধাদের জন্য চাল সংগ্রহ করতে এসেছে। হঠাৎ দুপুরের পর গ্রামে হইচই পড়ে গেল। মানুষজন দৌড়ে পালাচ্ছে। গ্রামে মিলিটারি ঢুকেছে। তিন যোদ্ধার তিন রাইফেল থ্রিনট থ্রি। দেখা গেল, বড় একটি ছই ছাড়া নৌকায় পাঁচজন পাকিস্তানি সৈন্য, চারজন রাজাকার এসে নেমেছে। যুদ্ধংদেহি ভাব নেই তাদের মধ্যে। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের চোখে চোখে রাখল। তারা অস্ত্রে কম, লোকসংখ্যায়ও কম। তারপরও এক হাত দেখে নেবে তারা। তা ছাড়া আত্মসম্মানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানি দেখে মুক্তিযোদ্ধারা পালালে গ্রামের লোক ঝাঁটা দিয়ে পেটাবে। ছেলেরা গুলি করলে গ্রামের মানুষও মারা যাবে। তবে তারা প্রস্তুত রইল। কিছুক্ষণ পর পাকিস্তানিরা দুটি মেয়ে, একটা খাসি, কিছু মুরগি নিয়ে নৌকায় ওঠে। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের মাথার ওপর দিয়ে গুলি করল। তারা জানে, সে ক্ষেত্রে দুই মেয়ে এবং রাজাকাররা পানিতে ঝাঁপ দেবে। কেননা, তারা নদীতীরের মানুষ, ভালো সাঁতার জানে। নৌকায় থেকে যাবে পাঁচ পাকিস্তানি সৈন্য। এরা গুলি করতে পারবে না, কেননা তখন ওরা প্রাণে বাঁচার জন্য ব্যস্ত থাকবে এবং নৌকা তখন দুলতে থাকবে। হলোও ঠিক তাই। গুলিতে সব পাকিস্তানি মারা গেল কি না, বোঝা গেল না। কেননা নৌকা ভেঙে ডুবে গেল। ডুবে গেল পাকিস্তানিরা। মেয়ে দুজন সাঁতরিয়ে উঠে এল। রাজাকারদের চারজনকে ধরল গ্রামবাসী।

সেই তিনবন্ধু হাসেম, মুক্তা এবং হোসেন এমন নিচু স্বরে আমাকে এ কাহিনী বলছিল, যেন তাদের লজ্জায় না পড়তে হয়। আমি তো যুদ্ধ সংগ্রহ করি। তাদের এটা তো কোনো যুদ্ধ নয়।

যুদ্ধেরও ব্যাকরণ থাকে। একাত্তরে গণযোদ্ধারা প্রমাণ করেছে, সেই ব্যাকরণেরও ব্যত্যয় আছে।

৬.

নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ।

সাতক্ষীরার শ্যামনগর থানার হাইস্কুলে জড়ো হয়েছে পাকিস্তানিরা। বৃহত্তর বরিশাল এলাকা থেকে পাকিস্তানিরা পালিয়ে জড়ো হচ্ছে বরিশাল শহরে। পালাতে পারেনি এরা।

এখন ওদের আনুষ্ঠানিক পরাজয় কেবল সময়ের ব্যাপার। স্কুলের ভেতর সুরক্ষিত অবস্থান নিলেও সহায়হীন ও সমর্থনহীন এরা। মুক্তিযোদ্ধা এবং এলাকাবাসী কঠিন অবরোধ তৈরি করে রেখেছে। আহার বা রসদের ব্যবস্থা নেই ওদের। পাশবিক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে থেকে থেকে জানালা দিয়ে গুলি করছে। লোহার খাড়া শিকের জানালা। এতে মুক্তিযোদ্ধারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু দূর থেকে তারা জানালার ভেতরে শত্রুর ওপর কার্যকরী গুলি করতে পারছে না। এমন সময় এক কিশোর প্রস্তাব করল যে সে ক্রলিং করে নিচ দিয়ে গিয়ে জানালা দিয়ে দুটি গ্রেনেড পর পর ফেলে আসবে সেই ঘরটিতে, হতাহত করবে শত্রুদের। ছেলেটির ক্রলিং করে এগিয়ে যাওয়া যেন শত্রু দেখতে না পায়, সে জন্য অনবরত মুক্তিযোদ্ধারা জানালার দৃষ্টিতে গুলি করতে থাকবে। ছেলেটি দুটি গ্রেনেড ছুড়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত এই গুলিবর্ষণ অব্যাহত থাকবে।

মৃত্যুর এতটুকু তোয়াক্কা না করে ছেলেটি পরিকল্পনামতো এগিয়ে গেল। মুক্তিযোদ্ধারা সবই দেখতে পাচ্ছে। পাকিস্তানিরা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কিছু অনুমানও করতে পারছে না। প্রথম গ্রেনেডটি নিক্ষেপিত হলো। বিকট শব্দে গোটা এলাকা প্রকম্পিত করে গ্রেনেডটি বিস্ফোরিত হলো। হতাহত যা ই হলো বাইরে থেকে কিছুই দেখা গেলনা। তবে শত্রু যে হতভম্ব হয়ে গেছে, বেশ বোঝা গেল। সঙ্গে সঙ্গেই ওদের গুলিবর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল। এবার দ্বিতীয় গ্রেনেডটি ছোড়া হলো। নিষ্ঠুর নিয়তি এবার বাদ সাধল। গ্রেনেডটি জানালার শিকে লেগে সবার চোখের সামনে ছেলেটির পিঠের ওপর এসে পড়ল। মুহূর্তেই বিকট শব্দে কচি কিশোরটির দেহ ছিন্নভিন্ন করে গ্রেনেডটি বিস্ফোরিত হলো।

এভাবে কি ক্ষণজন্মা হতে হয় বীরদের?

৭.

আমাদের সন্তানদের বলি।

কলঙ্কের সঙ্গে কেউ থাকতে চায় না, মানুষ থাকতে চায় গর্বের সঙ্গে। তোমরা স্ফীতবক্ষে গর্বের সঙ্গে বলো, আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তোমরা কি দেখেছ কেউ গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কখনো বলেছে, আমার বাবা জেলা শান্তি কমিটির সভাপতি ছিলেন বা রাজাকার কমান্ডার?

গর্ব করার অন্তত উপকরণ এ জাতি তোমাদের দিয়েছে। বুকভরা অহংকারের সঙ্গে মাথা উঁচু করে তোমরা বলবে—মাতৃভাষার সম্মান এবং মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষার জন্য যুগপৎ রক্ত দিয়েছি গোটা পৃথিবীতে শুধু আমরাই। স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার তোমরা নিশ্চিত করবে।

সূর্য হেলে পড়েছে। অদূরে ঘণ্টাধ্বনিও শুনতে পাচ্ছি। একাত্তরের ঘন কালো রক্ত এ দেশের অবারিত শস্যক্ষেতে আর ধূসর ধুলায় হারিয়ে গেছে। আজকের এই বাংলাদেশ অনেক কষ্টের আর অনেক রক্তের বিনিময়ে পাওয়া। এ পবিত্র আমানত

তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। জীবদ্দশায় স্বাধীন দেশে অনেক কষ্ট পেয়েছি, মরণের পর তোমরা আর কষ্ট দিওনা।

চোখ বুজবার সময় হয়ে এল। তোমরা দেখো, চোখে পানি নিয়ে যেন আমাদের চোখ বুজতে না হয়।

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

জন্ম : ২৪ জুলাই ১৯৫২, কুমিল্লা। শিক্ষা : যশোর জিলা স্কুল এবং ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ। একাত্তরের ১৩ই এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষার আঠারো দিন আগে ২৫ মার্চ বর্বর ও ইতর পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালিদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করলে যোগ দেন ২ নম্বর সেক্টরে। বাহাত্তরে সেনাবাহিনীতে নির্বাচিত হয়েও মিলিটারী একাডেমী প্রতিষ্ঠার বিলম্বের কারণে চুয়াত্তরের ৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে পরের বছর ১১ জানুয়ারি ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এ কমিশন লাভ করেন। ১২ জুলাই ১৯৯৬ স্বেচ্ছায় অবসর নেন। ১৯৮৩ সালে বেইজিং ভাষা ও সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চীনা ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তার বইয়ের সংখ্যা ২২টি, সামরিক ইতিহাসের উপর লেখা ১টি এবং শিশুতোষ গ্রন্থ ৩টি।

স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের ক্রান্তিকাল
ডা. মৃগেন কুমার দাস চৌধুরী

একাত্তর সালে আমি ৩য় বর্ষে অধ্যয়নরত মেডিকেল ছাত্র। সিলেট মেডিকেল কলেজে পড়ি। কলেজে তখন অরাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন (অগ্রগামী) করতাম। কিন্তু বাঙালির মুক্তির ডাক প্রাণে সব সময় গভীর রেখাপাত করত। পিতা প্রয়াত মন্মথ কুমার দাস চৌধুরী ছিলেন কমলগঞ্জ থানা (বর্তমান মৌলভীবাজার জেলাধীন) আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সহকারী সভাপতি। পরিবারে শৈশব অবধি ছিল বাঙালি জাতিসত্তার অনুধ্যান। বাড়িতে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর আনাগোনা লেগেই থাকত। সত্তরের জাতীয় নির্বাচন ও পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তপ্ত পরিবেশে আমরা ছিলাম মনে প্রাণে প্রভাবিত। এর রেশ ধরে পারিবারিকভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা হয়ে পড়েছিলাম সম্পৃক্ত। ফলশ্রুতিতে এক পর্যায়ে দেশমাতৃকার হাতছানিতে পড়াশুনা গুটিয়ে প্রাণের আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম সক্রিয় সমস্ত মুক্তিযুদ্ধে। আমার পিতৃদেব ছাড়াও এখন করিমগঞ্জে অবস্থানরত এম পি জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী ও জনাব লতিফ সাহেব এ ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। ৪নং সেক্টরের কমান্ডার লে. কর্ণেল (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) সি আর দত্ত মহোদয়ের সাথে সাক্ষাতে তা আরো পরিপক্ক হয়। ঐ সেক্টরের অধীনে সিলেট অঞ্চলের লাঠিটিলা সীমান্তে স্থাপিত সাব-সেক্টরে নিয়ন্ত্রিত হয় পরবর্তী কর্মতৎপরতা। জুলাইর মাঝামাঝি সময়ে দিলখুশ চা-বাগানে এক সম্মুখ যুদ্ধে ক্যাপ্টেন সরিফুল হক (ডালিম) আহত হলে ফ্লাইট লে. কাদের সাহেব এ সাব-সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। অক্টোবরে ক্যাম্পে একদল ভারী আরটিলারি বাহিনী (২য় ফিল্ড আরটিলারি বাহিনী) যোগ দিলে আমাকে ওদের সাথে সম্পৃক্ত করায় যুদ্ধক্ষেত্রে নবতর অভিজ্ঞতার সংযোজন হয় ও মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় সূচিত হয় উনাদের সাথে। যুদ্ধের মূল কলা-কৌশল ও পরিকল্পনা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মধ্যেই সীমায়িত থাকত এবং প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা রক্ষিত হতো গুরুত্ব সহকারে। তবে অক্টোবর মাসে যুদ্ধের গতি লক্ষ্যণীয়ভাবে ত্বরান্বিত হয় ও দখলদার বাহিনীকে চূড়ান্ত আঘাতের সময় সন্নিকটবর্তী বলে প্রতীয়মান হয়। দীর্ঘকালের স্মৃতির অপভ্রংশ ও তৎকালীন সংরক্ষিত সংক্ষিপ্ত ডাইরির সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধের অন্তিম মুহূর্তের স্মৃতি কথাটুকু লিখিত হল।

২৯ অক্টোবর শুক্রবার, মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক(সশস্ত্রবাহিনী প্রধান) জনাব কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী দুপুর সোয়া বারটায় সেক্টর কমান্ডার সি আর দত্ত সহ ক্যাম্পে

আসেন ও সব মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তাঁদের ক্যাম্পে আগমন ও প্রস্থানকালীন অভ্যর্থনায় সংশ্লিষ্ট ছিলাম। দীর্ঘকালীন যুদ্ধের দিশারীতে আমাদের বাংলাদেশ বাহিনীতে ইউ (আর্মি মেডিকেল কোর)-তে যোগ দেয়া সম্পর্কে ও ক্যাম্পের স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। ঐদিনই বিকেলে ক্যাম্পে যোগ দেন আরটিলারির একজন ক্যাপ্টেন রশিদ সাহেব ও তরুণ একজন সে. লে. সাজ্জাদ। সাথে ছ'টি গান সহ্ আরটিলারি বাহিনীর সদস্যরা। পরদিনই যোগ দেন একদল ভারতীয় আরটিলারি প্রশিক্ষক। ৫ নভম্বের বেতাল রেজিমেন্টের কিছু সদস্য যোগ দেন আমাদের সাথে। পরদিন প্রায় ৭৮ জনের একদল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা বাহিনী দল আসেন আমাদের সাথে। ৭ নভেম্বর দিলখুশ চা-বাগানে বেঙ্গল রেজিমেন্ট কর্তৃক একটি প্রচণ্ড আঘাত হানার জন্য অ্যাম্বুশ্ রচনা করেছিলেন। দিনটি ছিল প্রচণ্ড উদ্বেগপূর্ণ। সারাদিন যাবত চলছিল বৃষ্টি আর বৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত কিছুই ঘটল না। তবে জুড়ি বড়লেখা অঞ্চলে পাকিস্তানী সেনাদের উপর আমাদের আক্রমণ অব্যাহত ছিল। ১২ নভেম্বর গেরিলা আরটিলারি বাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে বেঙ্গল রেজিমেন্ট দিলখুশ বাগানে আক্রমণের ব্যূহ রচনা করল। এবারেও তেমন সফলতা এল না। গোলা বারুদের স্বল্পতা আমাদের পিছু হটতে বাধ্য করে।

তবে মাইনের আঘাতে দখলদার বাহিনীর কিছু ক্ষয় ক্ষতি হয়। ১৭ নভেম্বর ক্যাম্পে সে. কমান্ডার উনার ভাষণে যথাসত্বর (চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি হিসাবে!) সবাইকে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ কল্লে ক্যাম্প ছাড়ার নির্দেশ দেন। ঈদুল ফিতরের পরবর্তী দিন ২১ নভেম্বর রবিবার— সর্বশেষ দিন ধার্য হল। শুধুমাত্র আরটিলারি বাহিনীর সদস্য ব্যতীত এরপর আর কারোর ক্যাম্পে অবস্থানের অনুমতি রইলো না।

মুক্তিবাহিনীর প্রথম নিজস্ব আরটিলারি আক্রমণ

পরদিনই পাথরকান্দি সন্নিকটবর্তী ব্রিগেড হেড অফিসে ক্যাপ্টেন রশীদ সাহেবের সাথে গেলাম এ আক্রমণের প্রস্তুতিমূলক আলোচনা কল্লে। গান গানার, কিছু অফিসার সহ ঐ রাতেই মোকামটিলার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানো হলো। ১৯ নভেম্বর, শুক্রবার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। লে. সাজ্জাদ সহ সকাল ১০টায় গিয়ে পাথারিয়ার গান অবস্থানে পৌঁছালাম। জেড ফোর্সের অধিনায়ক লে. কর্ণেল জিয়াউর রহমান (সাবেক রাষ্ট্রপতি) ছিলেন একই সাথে। পাহাড়ের উপরে অবস্থানকারী গানে নিচ থেকে ভারী ভারী গোলা উঠাচ্ছি আমরা প্রবল উদ্যমে। বেশ কিছু গোলা আমি ও জিয়াউর রহমান সাহেব দুজনে হাতাহাতি করে উঠিয়েছি। উঠতে উঠতে কথা হয়েছে অনেক। পরিচয়ের প্রথমদিকে এল্ এফ হিসাবে আমার পরিচয়টুকু আবার ঝালাই করে নিচ্ছিলেন। এ আক্রমণে নিয়মিত সেনাবাহিনীর লোকেরাই ছিল প্রায় সবাই। যারা যুদ্ধকালীন সময়ে এম এফ (মুক্তিফৌজ) নামে অভিহিত হত। গেরিলা ট্রেনিং বা উচ্চতর ট্রেনিং নিয়ে যারা নতুনভাবে যুদ্ধ অংশ

নিয়েছি। তারা এফ এফ (ফ্রিডম ফাইটার) নামে পরিচিত ছিল। আমাকে জে ও সি এম এফ হিসাবে পদায়িত করা হয়েছিল। ইতিপূর্বে ১৮ অক্টোবর, সোমবার অপরাহ্নে জিয়াউর রহমান সাহেব আমাদের বেস ক্যাম্পে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখেছিলেন। এখন একান্তে খোলাখুলি আলোচনার সুযোগ ঘটেছিল। ঐদিন সন্ধ্যায় ফেরার পথে উনার সাথে মাসিমপুর ক্যাম্পে (সেক্টর প্রধানদপ্তর) যাই। পথে বারপুঞ্জি বেস ক্যাম্পে রাত্রি যাপন করি। ঐ ভোর রাতে ক্যাম্পের আশে-পাশে বিক্ষিপ্তভাবে শত্রুপক্ষের ক'টা বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল। পরদিন ভোরে জিয়াউর রহমান সাহেব সহ মাসিমপুর পৌঁছেছিলাম। স্বাধীনতা যুদ্ধের বহুল আলোচিত ঐ ব্যক্তিত্বের সাথে একান্তভাবে পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল যুদ্ধক্ষেত্রে এভাবে। যা হোক, সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। দুপুর বারটা গড়িয়ে গেল, প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দের ফোয়ারা বইয়ে প্রথম গোলা ছোড়া হলো শত্রুর দিকে। চারিদিকে ধ্বনিত করে আওয়াজ হল,— "আল্লাহু আকবর", 'জয় বাংলা'। বেলা দু'টা পর্যন্ত সময়ে প্রায় ৬০ টি গোলা নিক্ষিপ্ত হলো আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের ১ম আরটিলারি বাহিনীর নিজস্ব গান থেকে।

পরদিন ঈদুল ফিতর ২০ নভেম্বর, শনিবার। পবিত্র দিনটি কাটলো পবিত্র উদ্দেশ্যে, মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার মহান সংকল্পে প্রবাসী মাটিতে পাথারিয়ার জঙ্গলে। অবশ্য দুপুরে একটু ভালো খাবার আয়োজিত হলো অস্থায়ী নঙ্গরখানায়। লে. সাজ্জাদের পাশে অ, পি (O.P) পোস্টে বসে কাটালাম। সারাদিন গভীর প্রতীক্ষায় কাটালাম শত্রুপক্ষকে 'গোলায়-গোলায় "ঈদ মোবারক" জানাবার একান্ত আগ্রহে। কিন্তু সেখানে থেকে সুষ্ঠু কোনও লক্ষ্যবস্তু স্থিরীকৃত করতে না পারায় মনের অভীষ্ঠ অপূর্ণ থেকে গেল। ২৩ নভেম্বর প্রবল আক্রমণের মুখে জকিগঞ্জ শত্রুমুক্ত হলে আমাদের প্রাণ উথলিয়ে উঠলো। ২৫ নভেম্বর ভারতীয় আরটিলারি প্রশিক্ষকদের বিদায় জানানো হল। পরদিন মুক্তিযোদ্ধা রব (ইঞ্জিনিয়ার) সাহেবের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত মোকামটিলার হাইডআউট ক্যাম্প গুটিয়ে আনা হল। আমি একই সাথে বেস ক্যাম্পে ফিরে এলাম। পরদিন গানও নিয়ে আসা হল। ২৮ নভেম্বর গান কৈলাশহরের দিকে গেল সমসেরনগর দখলের উদ্দেশ্যে, ক্যাম্পে ব্যস্ততায় আমার যাওয়া হলো না। ৩০ নভেম্বর ভারতীয় পত্রিকায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিবৃতি ছাপা হলো "The month which begins tomorrow is very remarkable for the nation" ("আগামীকাল যে মাসের সূচনা হচ্ছে তা জাতির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ") এ বিবৃতি আমাদের প্রবলভাবে আলোড়িত করল। ১ ডিসেম্বর, বুধবার দিলখুশ চা-বাগানের প্রতিরক্ষা ক্যাম্প ছেড়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা পালিয়েছে। পরদিন ফ্লা. লে. নুরুল কাদের, রব ভাই সহ আমরা দিলখুশ বাগানে জাতীয় পতাকা উঠালাম। ঐ দিন সন্ধ্যায় আমাদের যাত্রা শুরু হল। রাণী বাড়ি চা-বাগানে আমাদের গান অবস্থান নিল। লক্ষ্য, রত্না চা-বাগান, সাগর নাল ইত্যাদি। ৩ ডিসেম্বর ভারত সরকার দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেন। পরদিন আমাদের গানের

অবস্থানের পাশে জুড়ি এলাকায় ভারতীয় বাহিনীর বিমান আক্রমণ হল। ঐ দিন আমাদের গান ১৫ সাগর নাল ইউনিয়নের অন্তর্গত জাঙ্গালিয়া গ্রামে স্থানান্তরিত হল। স্থানটি ফুলতলা চা-বাগানের সন্নিকটবর্তী। মনে দারুণ শিহরণ। আমাদের সাথে মিত্রবাহিনীর বিরাট বহর। সীমান্তে ভারতীয় মহিলারা রাস্তায় রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে ললাটে লাল বিজয়টিকা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিলেন মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর জোয়ানদের। মাতৃত্বের পরশে আবেগাপ্লুত হয়ে চোখ অশ্রুসিক্ত হল। সন্ধ্যায় আমাদের কনভয় জুড়ি নদী পেরিয়ে গেল আরও অভ্যন্তরে। ৬ ডিসেম্বর আমরা ভারতের স্বীকৃতি লাভ করলাম। ৯ ডিসেম্বর ম্যারিনা চা-বাগানের ম্যানেজার মি. মাজিদ আমাদের হাতে গ্রেফতার হন দালালীর অভিযোগে। এ দিকে সামনে এগুনোর পর্যাপ্ত যানের অভাব দেখা দিল। নতুন অফিসার মেজর রশীদ আমাদের বেটবীর বি সি হিসাবে যোগ দিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। পরবর্তী দু'দিনেও যানের অভাব মিটল না। উত্তেজনা মুহূর্তে নিষ্ক্রিয়তাও খারাপ লাগে। নিজ গাড়ি দিয়ে টানিয়ে গান ব্রাহ্মণবাজারে নিয়ে যাওয়া হল। স্থানটি বর্তমান জেলা সদর মৌলভীবাজার থেকে ১৫ মাইল দক্ষিণে। আমি বিকেল সাড়ে চারটায় গান অবস্থানে এলাম। এ স্থানটি ৪ দিন পূর্বে পাক বাহিনী মুক্ত হয়েছে। ১০ ডিসেম্বর দলে দলে বিভক্ত হয়ে ব্রাহ্মণবাজার ত্যাগ করি। পথে ইটা চা-বাগানের ফাঁড়ি উদনীতে আমাদের গাড়ি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। বিকেল চারটায় ফেঞ্চুগঞ্জ কলেজ ও কাশেম আলী হাইস্কুলে আশ্রয় নেই। প্রায় ২৪ ঘন্টা অবস্থানের পর পরদিন বিকেলে ফেঞ্চুগঞ্জ কলেজে রাত ১০-৩০ মিনিটে পৌঁছাই মাইজগাঁও রেল স্টেশনে। পরবর্তী যোগাযোগের অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মে শীতের আড়ষ্টতায় বসে রইলাম। স্টেশন মাস্টারের অনেক প্রচেষ্টায় তখনকার ই পি আই ডি সি-র (ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা) একটি রেল ইঞ্জিন সংগৃহীত হল। মালগাড়ীর বগিতে করে রাত ১১-৩০ মি. মোগলবাজার পৌঁছালাম। স্টেশনের পাশের মসজিদের বারান্দায় রাতে শোবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। পাশের গান অবস্থান থেকে সিলেটের দিকে মুহুর্মুহু গোলা বর্ষিত হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে কাঁপিয়ে প্রচণ্ড শব্দে। তখনও প্রচুর ভারতীয় সৈন্য এগোচ্ছে সিলেটের দিকে। খুব তাড়াতাড়ি সিলেটের পতন হবে এমন প্রত্যাশা দৃঢ়তর হলো। পরদিন পার্শ্ববর্তী নইখাই গ্রামে মুসলিম লীগ নেতা ও পাকিস্তানী মন্ত্রী আজমল আলীর বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। এ বাড়িতে পাকবাহিনী রক্ষিতা দুটা মেয়েকে উদ্ধার করে নিজ উদ্যোগে সন্ধ্যার পূর্বেই তাদের আত্মীয়স্বজন খুঁজে সমঝিয়ে দেই।

বহু প্রতিক্ষীত সে দিনটি আজ-

মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান জেনারেল মানিকশো'র হুঁশিয়ারী যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের মনোবল নষ্ট করে দেবার কৌশল হিসেবেই আমার কাছে ধারণা জন্মিয়েছিল। শক্তিশালী পাকসেনা

এতে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করবে না এ ছিল আমার একান্ত বিশ্বাস। সময়ের সাথে মনের বাধনহারা উদ্যম গতি প্রবল বেগে এগিয়ে চলছে সে চূড়ান্ত যুদ্ধ আর চূড়ান্ত বিজয়ের পানে। রাতভর গড়িয়ে সকাল, সকাল গড়িয়ে দুপুরের দিকে। ঘন ঘন গোলার আঘাতে ও শব্দে চতুর্দিক মুখরিত। আর পিছুবার পথ নেই। হয় এখানেই মরতে হবে, নতুবা হানাদারদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে। চূড়ান্ত পরীক্ষা সম্মুখে। সময়ও সংকীর্ণতর হয়ে আসছে। মনে একই চিন্তা, চোখের সামনে দীর্ঘকালের স্বপ্নের বাস্তবায়নের চিত্র। টগবগ করছে মন। হৃদয় ভর্তি আবেগের প্রাবল্য। অপরিসীম শক্তিতে বলীয়ান আমরা। নিজ দেশের জনগণের মাঝে এসে সে শক্তি আরও বীর্যবান। এ মুহূর্তে দেশমাতৃকার কোলে জীবন ঝরে পড়লে পরম শান্তিতে চির নিদ্রা লাভ করবো। এ ভাবনা মনে যুগিয়েছে বাঁধনহারা দোর্দণ্ড প্রতাপ। এরই মধ্যে—তখন প্রায় বেলা ১১টা, হাই কমান্ডের নির্দেশে আমাদের সব জাতীয় গোলাবর্ষণ আকস্মিকভাবে স্তব্ধ হল। তখন সিলেট শহরে সর্বশেষ টিকে থাকা জনগণ আমাদের আশ-পাশের গ্রামে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ছুটাছুটি করছিল। যুদ্ধের গতি কেহ আঁচ করতে পারছিল না। রেডিওতে বাজছিল রণ সংগীতের সুর। সন্দেহের জাল ছাইয়ে ফেললো আবেগাপ্লুত হৃদয়কে ছেয়ে গেল। এদিকে রেশন নিঃশেষ। প্রতিবেশীরা রাতের খাবার যোগান দিলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ক্যাপ্টেন রশীদ বিকেলে জিপে সিলেট গেলেন, রাতে ফিরলেন না।

পরদিন ১৭ ডিসেম্বর শুক্রবার। খুব ভোরে রশীদ সাহেব ফিরলেন, প্রথম দেখা আমার সাথে। বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ডাক্তার বাবু, আমরা স্বাধীন হয়ে গেলাম"। এরপর সব জোয়ানদের লাইনআপ করায়ে এ সঠিক খবর পরিবেশিত হলো প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে। চল্‌লো কোলাকুলি আর নৃত্যের পালা, রেডিওর রণ সংগীতের তালে তালে। সে দিনকার এসময়ের আনন্দ কাকে কি করে বুঝাই।

পরদিন বিকেলে ক্যাপ্টেন রশীদ সহ এলাম সিলেট। শহরে ঘুরাঘুরি করে গেলাম এয়ারপোর্ট রোডে রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে। কেন্দ্রীভূত আত্মসমর্পণকারী পাকসৈন্যদের দেখলাম। নিরস্ত্র মিলিটারি পোষাকধারী বিভিন্ন রেজিমেন্টের জোয়ানদের ঘুরাঘুরি করতে দেখলাম, কেহ রাঁধছে কেহ নামাজ পড়েছ, কেহবা গল্প করছে। সীমানা প্রাচীরের বাইরে সশস্ত্র ভারতীয় সৈন্যের বেষ্টনীতে ওরা আবদ্ধ ছিল। পাকবাহিনীর সিলেট অঞ্চলের অধিনায়ক সরফরাজ খানের সাথে ক্যাপ্টেন রশীদের স্বল্পকালীন সাক্ষাৎকালে আমি বাইরে ছিলাম। সিলেটে একদিন থেকে কলেজ, হাসপাতাল, হোস্টেলের অনেকের সাথে দেখা হল, অনেক কথা জানা হল। সশ্রদ্ধচিত্তে হৃদয়ের প্রণতি জানালাম শহীদ স্যার সামসুদ্দীন সাহেবের বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে। শ্রদ্ধা জানালাম শহীদ ডাক্তার লালা ও সঙ্গীদের প্রতি।

এরপর গুটানোর পালা। ফিরলাম ক্যাম্পের দিকে। এরপর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিদায়ের করুণ অধ্যায়। আমার সাথের অস্ত্র (স্টেনগান) টা তুলে নেবার জন্য ভারতীয় সৈন্যরা

দেখা হলেই চাপ দিতে লাগল। দেশের তহবিলে অস্ত্রটা জমা হবে—এ অভিব্যক্তিতে কোন রকমে অস্ত্রটি দেশে ফিরিয়ে এনেছিলাম। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর আহবানে অনুরক্ত হয়ে মৌলভীবাজারে মহকুমা হাকিম জনাব নিয়ামত আলীর কাছে উদ্বৃত্ত গোলা ও ম্যাগাজিনসহ স্টেনগানটি জমা দেই। সুখদুঃখের সাথী মুক্তিযোদ্ধারা স্তরে স্তরে হারিয়ে গেল দেশজুড়ে। আর সে মধুময় স্মৃতি নিয়ে বিদগ্ধ চিত্তে দীর্ঘ ছাব্বিশটি বছর জুড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই স্বপ্নিল স্বাধীনতাকে যার জন্য পণ করেছিলাম আমরা প্রাণ। "মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, মোরা একটি মুখের হাসির জন্যে অস্ত্র ধরি"। আর এ প্রজন্মের মুখে হাসি ফুটিয়েই আমরা আনন্দিত হব। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডা. মৃগেন কুমার দাস চৌধুরী

জন্ম : ৯ জানুয়ারি ১৯৫০, মৌলভীবাজার। শিক্ষা: কালীপ্রসাদ হাই স্কুল, মৌলভীবাজার, মুরারীচাঁদ কলেজ, সিলেট। সিলেট মেডিকেল কলেজের তৃতীয় [illegible] যখন তখনই যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে, ৪ নম্বর সেক্টরে। পরবর্তীতে গণযোদ্ধা হয়েও তিনি ২য় ফি[illegible]্যাটারী, আর্টিলারীতে গোলন্দাজ সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করেন।

ওসমানী মেডিকেল কলেজ শিশু শৈল্য বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

টু স্যার, উইথ লাভ

ফাতেহ আলী চৌধুরী

ইতিহাসের পাতায় জনৈক ক্যাপ্টেন হায়দারের নাম থাকবে কিনা জানি না। বর্তমান রাজনৈতিক ডামাডোলের ইতিহাসে হয়ত এই মহান মুক্তিযোদ্ধার স্থান নেই। তার প্রয়োজনও নেই। ইতিহাস কোনো রাজনৈতিক প্রচারপত্র নয়। তাই ইতিহাস কখনো সমকালীন হয় না। ইতিহাস কখনো বোধহয় লেখা যায় না। যা লেখা হয় তা হচ্ছে documentation বা রাজনৈতিক প্রচারপত্র। মেজর হায়দারের নাম লেখা হয়নি সমকালীন কোনো গাথায়। তবে হায়দার আছে সেক্টর-২ এর হাজার সহযোদ্ধার হৃদয়ে, তাদের লোকমুখে। আমার লেখাটি হায়দারের স্মৃতি ঘিরে তার সহযোদ্ধাদের oral histroy এর সামান্য একটি আলেখ্য মাত্র। এটি তার প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ। কোনো প্রচারপত্র নয়, কোনো ক্ষোভ নয়, কোনো দুঃখ নয়।

আমি, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া), বীর বিক্রম; কাজী কামাল বীর বিক্রম; গাজী দস্তিগীর বীর প্রতীক; সিরাজ আরো অনেক দল বেধে চললাম স্বাধীনতার সন্ধানে। হাজির হলাম আগরতলায়। ঘটনাচক্রে ওখান থেকে মেজর আখতার বীর প্রতীক-এর সাহায্যে হাজির হলাম মতিনগর ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কর্তৃত্বাধীন সেক্টর -২ হেড কোয়ার্টার (তখন অবশ্য সেক্টর-২ গঠিত হয়নি) -এ। সেখানে দেখা হলো বাদল; আজিজ, বীর প্রতীক; আলম বীর প্রতীক, সহ ঢাকার অনেক ছেলেদের সাথে। সবাই বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ বা প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভিন্ন কলেজের ছাত্র। তখন ক্যাম্প হয়নি খাবার দাবারের ঠিক নেই। গাছতলায় থাকি। যাহোক তবুও কী যে অভূতপূর্ব শিহরণ। পরদিন সকালে সবাই হাজির পাহাড়ের নিচে। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছি। কমান্ডের বা নেতৃত্বের অপেক্ষায়। হঠাৎ পাহাড় থেকে নেমে এল মেজর খালেদ মোশাররফ। কমান্ডিং অফিসার বিদ্রোহী ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের। অবাক বিস্ময়ে দেখছি সুদর্শন বিদ্রোহী বীরকে। তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বললেন। আর পরিচয় করিয়ে দিলেন জনৈক ক্যাপ্টেন হায়দারের সাথে। হাত ভাঙা Sling-এ ঝুলানো। কুমিল্লা কান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে আসার সময় অথবা কুমিল্লার ইলিয়টগঞ্জ ব্রিজের Demolition- এ হাত ভেঙেছেন বা কেন যেন হাতে গুলি লেগেছে। শক্ত চেহারা, গ্রিক Sculpture-এর মতো। শুনলাম পাকিস্তানের বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত কমান্ডো বাহিনীর সদস্য। এই মেজর খালেদই হবেন সমগ্র ঢাকা এরিয়ার কমান্ডিং অফিসার এবং ক্যাপ্টেন

হায়দারের নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন সুবেদার/ হাবিলদাররা আমাদের বিভিন্ন অস্ত্রের ট্রেনিং দেবে।

আমাদের ট্রেনিং শুরু করালেন ক্যাপ্টেন হায়দার মতিনগরে। মুনীর ওস্তাদ, তরু ওস্তাদ ও আরও অনেকে ক্যাপ্টেন হায়দারের তত্ত্বাবধানে। আমাদের খাওয়া, তাবু তৈরি, জংগল কাটা থেকে ট্রেনিং সবই ক্যাপ্টেন হায়দারের নিজের তত্ত্বাবধানে করতেন। কী অমানুষিক পরিশ্রম করতেন ক্যাপ্টেন হায়দার। অসম্ভব শক্তিশালী এই মানুষটিকে আমি কোনোদিন ক্লান্ত হতে দেখিনি।

ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠে অদ্ভুত এক সম্পর্ক ক্যাপ্টেন হায়দারের সাথে। যেমন ভয় পেতাম তেমনি ভালোবাসতাম এই যুদ্ধের গুরুকে, স্যারকে। ট্রেনিং শুরু হলো। প্রথম দিন ৩০৩ দিয়ে ফায়ারিং করালো। প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। অস্ত্রের নমুনা দেখে বেশ হতাশ হয়ে গেলাম। হায়দার স্যারকে ভয়ে কিছু বলতে পারি না। তার পরদিন স্টেন গান দিয়ে ফায়ারিং করালো। বেশ লাগলো। এভাবে আমাদের হায়দার স্যার নানা রকম Explosive— ব্যবহার দেখালেন। একদিন আমাদের ৭৩৭ সেল্ফ লোডিং রাইফেল (এসএলআর) দিয়ে ফায়ারিং করালো—বাংলাদেশের ভিতর। পাকিস্তানি শত্রুর উপর আক্রমণ এটা অবশ্য এক ধরনের Mock Fight ছিল। সে কি গর্ব এবং আনন্দ আমাদের।

মাও-এর গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি বা চে-এর Box Abush ইত্যাদি রেফার করতেন ট্রেনিং-এর সময়। শত্রু যখন পলায়নরত তখন আক্রমণ করো, শত্রু যখন তোমাকে ধাওয়া করবে তুমি পালাবে, শত্রু যখন বিশ্রাম করবে তখন তাকে আক্রমণ করবে যাতে বিশ্রাম নিতে না পারে।

ট্রেনিং শেষ। একদিন Movement order এল। আমরা মতিনগর থেকে মেলাঘর এলাম সারারাত হেঁটে। হায়দার আবার শুরু করলেন মেলাঘরে নতুনভাবে নতুন ছেলেদের ট্রেনিং। যাদের সর্বপ্রথম মতিনগরে ট্রেনিং হয়ে গেছে তাদের যুদ্ধে যাবার পালা। ১৭ জন নিয়ে গঠিত একটি দল ঢাকায় পাঠিয়ে গেরিলা যুদ্ধ করার প্রস্তুতি ছিল হায়দারের দুঃসাহসিক যুদ্ধ পরিকল্পনা। যে রাতে ১৭ জনের দল প্রথম ঢাকা আক্রমণে পাঠাবেন স্যার ছিল ভীষণ উত্তেজিত—যা তিনি কখনো প্রকাশ করতেন না কিন্তু যা প্রকাশ হয়ে পড়লো তা হচ্ছে বিষণ্নতা। ঢাকায় এসে যোগাযোগ হলো মাসুদ সাদেক (চুল্লু) সামাদ বীরপ্রতীক, স্বপন বীরবিক্রমদের সাথে। ধীরে ধীরে আমাদের দল বড় হয়ে উঠলো। চললো অপারেশন ঢাকা শহরে। আলম ছিল এই দলের coordination-এ। পরবর্তীতে এটাই ক্র্যাক প্লাটুন বলে পরিচিত হয়।

প্রথম নিজের হাতের ট্রেনিংপ্রাপ্ত বাছাই ছেলেদের নিয়ে গঠিত এই দলটি। ২৯ আগস্ট ১৯৭১ সাল। ক্র্যাক প্লাটুনের কোনো এক অসর্তক মুহূর্তে কেউ একজন ধরা পড়ে। তার ফলে পুরো দল ঘেরাও হয় ঢাকার বিভিন্ন স্থানে। ধরা পড়ে শহীদ হন আলতাফ মাহমুদ রুমি বীর বিক্রম, বদি বীর বিক্রম, বাকের বীর প্রতীক, জুয়েল বীর বিক্রম ও আরো অনেকে। ধরা পড়ে বেঁচে যায় মাসুদ সাদেক চুল্লু সামাদ বীর প্রতীক, আলভী।

আমি মায়া, গাজী, মানু, আলম, জিয়া, শাহাদাৎ চৌধুরী ও সিরাজসহ কয়েকজন বেঁচে যাই। আমি প্রথমে মেলাঘরে হায়দার স্যারকে রিপোর্ট করি। হায়দার কথাটা শুনে প্রথমে থতমতো খেয়ে দৌড়ে ক্যাম্পে চলে আসেন। বাদল দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে। হঠাৎ শুনলাম হায়দার স্যার কাঁদছেন। কিছুদিন পরে আমরা মায়ার নেতৃত্বে ক্র্যাক প্লাটুনের বিরাট দল নিয়ে আবার ঢাকার দিকে রওনা হলাম। তিনটা সেকশনে ভাগ করা হলো দলটি—মায়া, গাজী ও আমি সেকশনের কমান্ড-এ থাকলাম। হায়দার স্যার ভারত সীমান্তে দাঁড়িয়ে আমাদের ইন্ডাক্ট করতে আসলেন। স্যারের মুখ গম্ভীর ও উত্তেজিত। হায়দার হঠাৎ আমার দিকে তাকালেন। আমাকে কাছে ডাকলেন—ফাতেহ্ কাছে এসো। এলাম। হায়দার স্যার আমার পিঠে হাত দিয়ে বললো "মনে আছে তোমাকে কেন যেন জিজ্ঞেস করেছিলাম তুমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো কাকে? তুমি বলেছিলে নিজের জীবন। আমি বলেছিলাম তবে যুদ্ধে এলে কেন? তুমি বলেছিলে সেই জীবনটা বাংলাদেশকে দিতে।" বলেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন ভীষণ চেপে। তারপর স্যার বললেন জেনারেল প্যাটনের একটা কথা— No bastards can win a war by dying for his country a bastard bastard can only can win a war by making other poor bastard dying for his country একটু হেসে বললাম That poor Pakistani bastards may make me die for my country। এবার আমাদের ঢাকা শহরে পাঠানো হলো না। পাঠানো হলো আশে পাশে থানাগুলোতে আড়াইহাজার, বৈদ্যের বাজার ও রূপগঞ্জ। শেষে ঢাকার পাশেই ইছাপুর, বাড্ডায় ত্রিমোহনী অবস্থান নিলাম। তখন বোধহয় ১১-১২ তারিখ- লে. কর্ণেল শফিউল্লাহ কমান্ড-এ ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মুড়াপাড়ার আশেপাশে অবস্থান নিলো। আমরাতো অবাক ২য় ইস্ট বেঙ্গল (এস ফোর্স) এল কেমন করে। যাহোক, আমরা আশা করেছিলাম সেক্টর-২ এর কে ফোর্স-এর কোনো ইউনিট আসবে। আমাদের একটু মন খারাপ। এমনি একদিন দুপুরে দেখলাম রূপসা নদীর পাড় ধরে হেটে আসছে মেজর হায়দার। তখন তিনি মেজর পদে পদোন্নতি পেয়েছেন সাথে দুজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা। সারারাত জেগে পুরো ক্র্যাক প্লাটুন পর্যায়ক্রমে পাহারা দিল আমাদের প্রাণপ্রিয় কমান্ডারকে। সেকি উত্তেজনা ও গৌরব। মেজর সমস্ত পথ অতিক্রম করে এসেছে তার প্রিয় ক্রাক প্লাটুন এর কাছে। স্যার ১ দিন বা ২ দিন ছিলেন আমাদের কাছে। ঠিক মনে নেই—বোধ হয় বিগ্রেডিয়ার সাবেগ সিং ভারতীয় ডেলটা বা ডি সেক্টর কমান্ডার হেলিকপ্টারে মুড়াপাড়া এল তারপর মেজর হায়দারকে নিয়ে ঢাকায় চলে গেল। ১৬ই ডিসেম্বর জানলাম মেজর হায়দার আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে আসবে—তোড়জোর করে ঢাকায় চলে আসলাম।

যাহোক, আমরা ঢাকায় ঢুকে মেজর হায়দারের কমান্ডে শান্তি রক্ষার চেষ্টা চালাই। আমি, আলম পরদিন রেডিও অফিসে যাই। ৮-৪৫ মি. রেডিও খুলে দেয়া হয় এবং মেজর হায়দার বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বক্তব্য দেয়। আমি, আলম ও জিয়া ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের গেট মেজর হায়দারের নির্দেশে খুলে দেই। আমরা সন্ধ্যায় টিভি ভবন

ঘেরাও করি। মেজর হায়দার বাংলাদেশ আর্মির পক্ষ থেকে বক্তব্য আর কিছু নির্দেশাবলী প্রচার করেন।

তারপর হায়দার লেডিস ক্লাবে অফিস নেয়। সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় সৎ, আদর্শবাদী সাহসী মেজর হিসাবে ঢাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার। তারপর হায়দার আস্তে ধীরে ফিরে যান তার নিজের প্রিয় আর্মি -এর কাজে। তারপর মাঝে স্যারের সাথে দেখা হতো ঢাকায়।

এল ৭ নভেম্বর, ১৯৭৫। এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হলেন মেজর হায়দার। হোমারের ইলিয়ডের ট্রয়ের দেশপ্রেমিক বীর হেক্টরের মতো করুণ অসহায় মৃত্যু।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জঞ্জালে ভরে গেছে। ইতিহাসের পরগাছা একদিন নিজেই বিলীন হয়ে যাবে। বেরিয়ে আসবে দেশের জন্য যে সব বীর আত্মাহুতি দিয়েছিল সে সব বীরদের কথা। এক অভাগা জাতির জন্য, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মে বীরগাথার প্রয়োজন। এই বীরদের উদ্দেশ্যে আমার যা বলতে ইচ্ছে করছে-

"In blossom today tomorrow scattered
Life is such like a beautiful flower
How can you expect the fragrance
To last for ever"
-Admiral Tajikito Ohinishi
Commander of Kamikaze Operation
Second World War (Japanese Navy)
He later committed Hara-kiri

ফাতেহ আলী চৌধুরী

জন্ম : ২ জুন ১৯৪৮, খুলনা। শিক্ষা : ঢাকা গ্রাজুয়েট হাই স্কুল, ঢাকা কলেজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স এবং মাস্টার্স। অনার্সের শেষ বর্ষের ছাত্র হিসেবে মেজর খালেদ মোশাররফের অধীনে ত্রিপুরার মতিনগর ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ফতেহ এবং আরো কয়েকজনকে প্রথম ঢাকা শহরে অপারেশনের জন্য পাঠানো হয়। তাদের দলটির নাম দেয়া হয় 'ক্র্যাক প্লাটুন'।

ফতেহ আলী চৌধুরীরা তিন ভাই 'ক্র্যাক প্লাটুন' এর যোদ্ধা। অপর দুই ভাই শাহাদৎ চৌধুরী এবং ডা. মোর্শেদ চৌধুরী।

মুক্তিযুদ্ধে বেরুবাড়ী

মেজর মোহাম্মদ শামসুল হক

১৯৭১। বাঙালি জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এবং অতীব গৌরবোজ্জল একটি বছর। একটি মহিমাজ্জ্বল অধ্যায়। একটি হিরন্ময় মাইলফলক। বহুদিন থেকে বাঙালি জাতি স্বাধীকারের আন্দোলনে দুর্বার গতিতে দুর্মর আবেগ নিয়ে এগিয়ে চলেছিল। আর উনিশ-শ' একাত্তরেই তারা সশস্ত্র সংগ্রাম করে তাদের বিজয়ের লাল সূর্যকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। বাঙালি জাতি তার বহুদিনের লালিত স্বপ্ন ও সাধনা নিয়মতান্ত্রিক পথে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৭০ এ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেও অধিকার পেল না। বাঙালি জাতিকে চিরতরে নিস্তব্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া খান ও টিক্কা খান সুপরিকল্পিতভাবে ১৯৭১ এর পঁচিশে মার্চের কাল রাতে ঘুমন্ত বাঙালি জাতির উপর চালিয়ে দিল ট্যাংক, কামান। মেশিন গানের গুলীতে নৃশংসভাবে হত্যা করলো নিরীহ নিরস্ত্র লাখো বাঙ্গালি নারী, পুরুষ শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে। ফলশ্রুতিতে তৎকালিন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক উদাত্ত আহবানে সাড়া দিয়ে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলে এবং অংশগ্রহণ করে মুক্তি সংগ্রামে। পরবর্তীকালে যথাসময়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি অফিসার মেজর জিয়াউর রহমানের সংগ্রামী আহবানে সাড়া দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন ই বি আর, ই পি আর, পুলিশ, ও আনসার বাহিনীর বাঙালি সদস্যবৃন্দ।

শুরু হয়ে গেল স্বাধীনতা সংগ্রাম। আমিও অন্যান্য ছাত্র, যুবকের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয় পাঠত্যাগ করে মসি ছেড়ে অসি ধরলাম হয়ে গেলাম মুক্তিযোদ্ধা। স্বজন ও সংসার পরিত্যাগ করে পাড়ি জমালাম সীমান্তের অপর পারে। গ্রাম গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ছে তখন হিংস্র হানাদার বাহিনী। তারা মেরে পুড়ে ছার খার করে দিচ্ছে বাড়িঘর মসজিদ মন্দির। এপ্রিল মাস থেকে শুরু করে নভেম্বর পর্যন্ত আট মাসে পাটেশ্বরীর যুদ্ধ, রায়গঞ্জের যুদ্ধ, জয় মনিরহাটের যুদ্ধ, সোনারহাটের যুদ্ধের মাঝদিয়ে মুক্তিযুদ্ধের রক্ত পিচ্ছিল বহু পথ পেরিয়ে এসেছি। "দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানাছলে। অশান্তির ঘূর্ণি সয়েছি জীবন স্রোতের পলে পলে। "ভুরুঙ্গাঁমারী, নাগেশ্বরী এলাকায় তখন তুমুল যুদ্ধ। যুদ্ধ আর যুদ্ধ। যুদ্ধই তখন আমাদের স্বর্গ, আমাদের স্বপ্ন, আমাদের জীবন-মৃত্যু। রাতের বিনিদ্র রজনীতে আকাশের গায়ে আমরা তখন কামানের গোলা আর মেশিনগানের গুলির আলোর ফোয়ারা দেখছি। গোলাগুলির শব্দের মাঝেই নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পেয়েছি

গুলি থেমে গেলে যেন হারিয়ে গিয়েছি। এমনি ভয়ঙ্কর আনন্দময় চলার পথে ছয় নম্বর সেক্টর কমান্ডার উইং কমান্ডার এম কে বাশার এবং সাব সেক্টর কমান্ডার মেজর নওয়াজ উদ্দিন আমাকে ডেকে আমার কোম্পানি নিয়ে আরো সম্মুখ পানে অগ্রাভিযান চালাবার আদেশ দিলেন।

সেদিন ছিল ১৯৭১ এর ১৭ নভেম্বর। সেক্টর কমান্ডার এম কে বাশার আমাকে বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে খুব শীঘ্রই আমরা অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনা-নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যরা সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হামলার দাঁত ভাংগা জবাব দিতে যাচ্ছি। বিভিন্ন কোম্পানিকে বিভিন্ন দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তোমার কোম্পানির দীর্ঘদিনের সংসাহসিকতাপূর্ণ তৎপরতায় আমি সন্তুষ্ট তাই আমি তোমার কোম্পানিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি দায়িত্ব দিচ্ছি। অপারেশনাল ম্যাপ দেখিয়ে বললেন, তোমার কোম্পানি নাগেশ্বরীর ঠিক পূর্বপার্শ্বেই অবস্থান নিয়ে শত্রুদের উপর আঘাত হানবে। মনে রেখো নাগেশ্বরীতে পাকহানাদার বাহিনীর ঘাঁটি মজবুত। আক্রমণ হেনে তাদের ঘাঁটি গুড়িয়ে দিতে হবে। আদেশ বুঝে নিয়ে কোম্পানি হেডকোয়ার্টার সোনারহাটে ফিরে এলাম। আমার কোম্পানি অধিনায়ক ইরফান আলী খান এবং মাহফুজুর রহমান কে বুঝিয়ে বললাম। বলা বাঞ্ছনীয় আমার কোম্পানিতে তখন কোম্পানি প্লাস মুক্তিযোদ্ধা। তাই আমার সহযোগিতার জন্য উপ অধিনায়ক ছিলেন দুইজন।

আদেশ অনুযায়ী ১৮ নভেম্বর রাত আটটার মধ্যেই আমরা দুধকুমার নদীর পূর্বপারে আমাদের কোম্পানি হেডকোয়ার্টারে মিলিত হলাম এবং পরবর্তী অভিযান সম্বন্ধে কিঞ্চিত আভাস দিয়ে বড় আকারের কয়েকটি নৌকা সংগ্রহের আদেশ দিলাম। স্থানীয় কয়েক জন মুক্তিযোদ্ধা খয়বর, রফিক, কাশেম ও অন্যান্য কয়েকজনকে নৌকা সংগ্রহের দায়িত্ব দেয়া হলো। রাত সাড়ে দশটার মধ্যেই তারা বড় বড় পাঁচটি ছই বাঁধা নৌকা এনে হেলডাঙ্গা ঘাঁটে ভিড়িয়ে দিল। তখন পাঁচটি প্লাটুন চার নৌকায় তুলে আমিও একটিতে চড়ে বসলাম। আমার সংগে থাকলেন আমার কোম্পানি উপ অধিনায়ক মাহফুজুর রহমান ও ইরফান আলী খান। বলা বাঞ্ছনীয় আমীর আলী খান ও ইরফান আলী খান দিনাজপুরের ছেলে এবং সহোদর।

১৮/১৯ নভেম্বর রাত ১২ টায় আমরা নৌকা ছাড়লাম। আধ মাইল দূরত্ব রেখে ভাটির টানে নৌকা ছুটে চললো বেরুবাড়ী অভিমুখে। ঘন্টা তিনেক চলার পর আমার গাইড আমাকে বললো ডান পার্শ্বেই চরবেরুবাড়ী। তখন পেন্সিল টর্চ মেরে ঘড়ির দিকে দেখলাম রাত তিনটা বাজে। নদীর ডান তীরে নৌকা ভিড়াতে আদেশ দিলাম। তারপর চারটি নৌকা একত্রিত হওয়ার পর আমরা নৌকা থেকে অবতরণ করলাম। নদীর তীর থেকে প্রায় দুইশতগজ পায়ে হেঁটে বেরুবাড়ী গ্রামে পৌছালাম। হাড় কাঁপানো শীত। নভেম্বর মাস মাত্র পবিত্র রমযানের শেষ দিন। গ্রামের একটি বাড়িতে গিয়ে দেখলাম সেহরি খেয়ে বাড়ির লোকজন আগুন জ্বালিয়ে হাত পা শেঁকছে। অকস্মাৎ আমাদেরকে

দেখে ভয় পেয়ে গেল। প্রথমত তারা আমাদেরকে রাজাকার ভেবে বলেই ফেললো, এখনইতো আপনাদের লোক পেট্রোল করে গেল। পরে জানতে পারলাম তারা পাকহানাদার বাহিনী। তখন আমি জানালাম আমরা রাজাকার নই মুক্তিযোদ্ধা। একথা শুনে আরো ঘাবড়ে গিয়ে বললো, হায় আল্লাহ! আপনারা এসেছেন জানলেতো আর আমাদের রক্ষা নেই। এক্ষুণি পাক বাহিনী এসে পড়বে। আমি অভয় দিয়ে বললাম, আপনারা ভয় পাবেন না আমাদের সাথে থাকেন আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ। তারপর কোম্পানি উপ অধিনায়ক মাহফুজুর রহমানের নেতৃত্বে একটি প্লাটুন প্যাট্রলিং এ পাঠালাম নাগেশ্বরী অভিমুখে।

১৯ নভেম্বর সকাল বেলায় সূর্য উঁকি দিচ্ছে কুয়াশার আবরণ ভেদ করে। মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক কাক কা কা করে উড়ে গেল। কি যেন এক অশনি সংকেত দিয়ে গেল তারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই পশ্চিম দিকে গুলি বিনিময় শুরু হলো। ঘাঁটিতে সবাইকে অস্ত্র হাতে প্রস্তুত হতে বললাম। এমন সময় উত্তর পার্শ্বের গ্রাম থেকে ১০/১২ বছরের একটি বালক দৌড়ে এসে বললো, "গ্রামের উত্তর দিক দিয়ে পাক সেনারা এই দিকে আসছে"। সংগে সংগে পেট্রোল পার্টি পাঠালাম। গ্রামের উত্তর দিকে যেতে না যেতেই মুখোমুখি গুলি বিনিময় শুরু হয়ে গেল। তখন দক্ষিণ দিকে আরেকটি প্লাটুন পাঠালাম, সে দিকেও একই অবস্থা। তিন দিকেই তিনটি প্লাটুন সম্মুখ যুদ্ধে ফেঁসে গেল। ভাবলাম যদি নদী পথ শত্রু মুক্ত রাখতে না পারি তাহলে সদলবলে মৃত্যু অনিবার্য। কারণ আমাদের কাছে তখন না ছিল মেশিন গান না ছিল মর্টার কিংবা রকেট লাঞ্চার। পাক সেনাদের পক্ষ থেকে আসছিল কামানের ভারী গোলা, রকেট শেলিং এবং মেশিন গানের ঝাঁকে ঝাঁকে ফায়ার।

নদীর ওপার থেকে সাপোর্ট ফায়ার দেয়ার উদ্দেশ্যে আমি ঘাঁটি ত্যাগ করে আমার ব্যক্তিগত হাতিয়ার সাবমেশিন কার্বইনটি ও গুলীভর্তি দুইটি ম্যাগজিন নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তখন তিন দিকেই তুমুল যুদ্ধ চলছিল পাকসেনাদের সাথে আমার মুক্তি বাহিনীর অকুতোভয় গেরিলাদের। আমার গেরিলারা গুলি করতে করতে পিছিয়ে নদীর দিকে আসছিল। অপর দিকে পাকসেনারা গুলি করতে করতে তিন দিক থেকে নদীর পথ বন্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে নদীর দিকে এগুচ্ছিল। এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল যে, কোনরূপে তিন দিক থেকে ওরা ঘেরাও করে ফেললে আমাদের পরাজয় যেন অনিবার্য। শত্রুব্যূহ ভেদ করে বের হয়ে আল্লাহর নাম স্মরণ করে "জয় বাংলা" বলে সাঁতার দিলাম খরস্রোতা দুধকুমার নদীতে। সাঁতার কেটে পূর্ব পাড়ে উঠে একটি কলার বাগানে গা ঢাকা দিয়ে নদীর পশ্চিম পাড়ের দিকে সাবমেশিন কার্বাইনের সাহায্যে গুলি চালালাম। কখনো সিংগেল ফায়ার কখনো অটোমেটিক ফায়ার। সংগে সংগেই কাজ হলো। শত্রু সেনারা এপার থেকে ফায়ারের আওয়াজ পেয়ে পশ্চাৎ অপসারণ করতে শুরু করলো। সেই সুযোগে আমার মুক্তি সেনারা নদীর দিকে বেরিয়ে আসছিল। কিন্তু

পিছন থেকে আসছিল কামান আর মেশিনগানের প্রচণ্ড গোলাগুলী। কামানের ভারী গোলা এসে পড়ছিল গগন বিদারী আওয়াজ করে।

একটানা প্রায় পাঁচ ঘন্টা উভয় পক্ষের ব্যাপক হতাহতের পর আমাদের মুক্তি সেনারা যার যার মতো নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতিয়ার পানিতে ছেড়ে দিয়ে সাঁতরাচ্ছিল। অপর দিকে শত্রু পক্ষের কামান আর মেশিনগানের গোলাগুলি এসে নদীর পানিতেই আঘাত হানছিল। কিছু আবার এপারেও এসে পড়ছিল। মুক্তি সেনারা অনেকেই সাঁতরিয়ে তীরে উঠতে সক্ষম হলো অনেকেই ভাসতে ভাসতে চলে গেল। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে আমার জানা সম্ভব হলো না কে কুল পেলো আর কে দুধকুমারের অথৈ জলে চিরতরে হারিয়ে গেল। অপরদিকে পাকসেনারা নদীর ওপারের সেই বেরুবাড়ী গ্রামটি থেকে প্রায় ২০/২৫ জন নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে ধরে এনে স্কুলের মাঠে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করলো এবং জ্বালিয়ে ভষ্মীভূত করে দিল চর বেরুবাড়ী গ্রামটি। গ্রামের মসজিদটিও বর্বরদের হাত থেকে রেহাই পেলো না। সেই দিন আমার সম্মুখেই শত্রুসেনারা যে ভাবে চর বেরুবাড়ী গ্রামের নিরীহ নিরস্ত্র নর-নারীকে নৃশংসভাবে ব্রাশ ফায়ার দিয়ে হত্যা করেছিল সেদৃশ্য আমি কোনো দিনই ভুলতে পারব না। আজও আমার চোখের সম্মুখে ভাসে চর বেরুবাড়ীর গ্রামের সেই লেলিহান শিখা এবং কানে ভাসে সেই প্রবীণ ব্যক্তিটির উক্তি "আপনারা এসেছেন জানতে পারলে পাক সেনারা আমাদের মেরে ও পুড়ে ভস্মীভূত করে দেবে"। সত্যি সেদিন ইয়াহিয়া খাঁ আর টিক্কা খাঁর বাহিনীর হাত থেকে যেমন রক্ষা পায়নি অসহায় নারী-শিশু ঠিক তেমনি মসজিদ মন্দিরও। সন্ধ্যায় অন্ধকারে কয়েকজন হাতিয়ার হারানো মুক্তিযোদ্ধাকে খুঁজে পেলাম। অতঃপর গ্রামের কিছু লোককে নিয়ে নদীতে ডুবে কিছু হাতিয়ার উদ্ধার করলাম।

পরদিন ২০ নভেম্বর ১৯৭১। রমজানের ঈদ। হৃদয় ভরা বেদনা দিয়ে ঈদের চাঁদকে এবারের মতো বিদায় জানিয়ে আমার হারিয়ে যাওয়া সূর্য সৈনিকদেরকে খুঁজতে থাকলাম। খুঁজতে খুঁজতে বহুভাঁটিতে এক চরে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ বশির ও সামাদের লাশ পাওয়া গেল। সেই চরে তাদের মরদেহ সমাহিত করা হলো। তারপর যুদ্ধ বিধ্বস্ত চর বেরুবাড়ীতে পাওয়া গেল আরো তিনজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের লাশ। পাওয়া গেল আমার ব্যাগ বহনকারী বালকটিকে। দেশ স্বাধীন হলে লেখা পড়া করে যে মানুষ হতে চেয়েছিল সে লাশ হয়ে পড়েছিল কাঁশবনের মাঝে। ওর হাতে ধরা ছিল আমার ব্যাগটি। যাতে থাকতো আমার নোট বই ও কোম্পানির জন্য আনা রেশন মানি।

চর বেরুবাড়ীর প্রাণে বেঁচে যাওয়া কয়েকজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করে জানলাম তাঁরা পাকবাহিনীকে ২০/২৫টি লাশ নিয়ে যেতে দেখেছে। আহত দেখেছে ৫০/৬০ জনের মতো। সকাল বেলা খবর পেয়ে বুক ভরা শুভেচ্ছা নিয়ে এগিয়ে এলেন কচাকাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মি. রুস্তম আলী। আমাকে জীবিত পাওয়ার আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। কারণ তার সাথে আমার পূর্ব পরিচয় ও গভীর

বন্ধুত্ব ছিল। বুক ভরা ভালোবাসা নিয়ে তিনি এদেশের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অভিনন্দন জানালেন।

২১ নভেম্বর সাব সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের সাথে সাক্ষাৎ করে জানলাম, আমার পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন, ১৫ জন নিখোঁজ হয়েছেন এবং ৩০টি হাতিয়ার নদীতে হারিয়ে গেছে। অপর দিকে শত্রুপক্ষের কমপক্ষে ২৫ জন নিহত, আহত পঞ্চাশের উর্দ্ধে। তিনি আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন "হাতিয়ার যা লাগে আমি দেবো, তোমার সৈনিক তুমি খুঁজে বের কর"। তারপর খোঁজ খবর নিয়ে জানলাম ফুলবাড়ি, বালারহাট এলাকার কিছু মুক্তিযোদ্ধা চলে গেছে দিনহাটায় তাদের আপনজনের কাছে। অতঃপর আমি লোক পাঠিয়ে, তাদেরকে অতিসত্ত্বর ফিরে এসে কোম্পানিতে যোগদানের অনুরোধ জানালাম। খবর পেয়ে ওরা সাবসেক্টর হেডকোয়ার্টারে সাহেবগঞ্জে ফিরে এল। তার সাথে আরও জনা পঞ্চাশেক নতুন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাসহ এক কোম্পানির উর্দ্ধে জনবল নিয়ে আমি পরবর্তী অভিযান পরিচালনা করেছিলাম।

সেই দুর্দিনে আমাকে সার্বক্ষণিক বন্ধুত্ব ও সাহচর্য দিয়েছিলেন রুস্তম সাহেব ও চর রহমানের কুটি স্কুলের শিক্ষক আজিজুর রহমান সাহেব। মতিউর রহমান মেম্বার সাহেব আমার কোম্পানিকে আশ্রয় দিয়েছেন, খাইয়েছেন, অপারেশনে সহযোগিতা করেছেন। এদেশের স্বাধীনতায় এদের সবার কাছেই আমরা সমান ঋণী। এদের সাহায্য সহযোগিতা না পেলে দেশের ভিতরে এসে শত্রু ঘাঁটিতে হানা দেয়া আমাদের পক্ষে কোনো মতেই সম্ভব হতো না। অতি সাম্প্রতিক কালে চর বেরুবাড়ীতে যোগাযোগ করে জেনেছি, যে ছেলেটি পাক হানাদারদের আগমনের সংবাদ দিয়েছিল তার নাম 'এলাহী বখশ' (১২) পিতার নাম গুইটা মুন্সি। পাক সেনারা সেই দিনই নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করেছিল। বন্দি বাংলাদেশের মাঝে শত্রু কবলিত মৃত্যু গুহায় থেকে ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কি পরিমাণ দরদ এদেশের মানুষের বুকে ছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সেই দিনের সেই শহীদ বালক 'এলাহী বখশ' ও তার মা-বাবা।

বলা বাঞ্ছনীয়, আমার কোম্পানির একগাদা মাইন ও এক্সুসিভসহ যে নৌকাটি পেছনে রেখে এসেছিলাম সেইটিও নদী পথে আসার সময় শত্রুর আক্রমণে পড়েছিল। যাত্রা বিঘ্নিত হলেও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। সেদিন যুদ্ধে আমাদের হাল্কা মেশিন গান, মর্টার ও রকেট লঞ্চারগুলো পেছনে রেখে আসায় আমরা যুদ্ধ মুহূর্তে কাভারিং ফায়ার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম। ফলশ্রুতিতে শত্রুসেনারা আমাদেরকে অতি সহজেই তিন দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। উপরন্তু যথারীতি রেকি করে ঐ এলাকায় ও শত্রুসেনাদের অবস্থান সম্বন্ধে অগ্রিম না জেনে আধুনিকতর অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত শত্রুসেনাদের মুখোমুখি সরাসরি নদীর পশ্চিম পাড়ে অবতরণ করা আমাদের উচিত হয়নি। আমাদের উচিত ছিল নদীর পূর্বপাড়ে নেমে সেখান থেকে গেরিলা অপারেশন

পরিচালনা করা এবং বিপদ কালের জন্য নদীর পশ্চিম তীরে অন্ততপক্ষে একটি নৌকা প্রস্তুত রাখা।

একাত্তরের সেই দিনগুলোর কথা মনে হলে আজও ভয় ও বিস্ময়ে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। সেদিন সময়মতো যেভাবে ক্ষুদ্র একটি সাবমেশিন কার্বাইনের ফাঁকা ফায়ার দিয়ে নদীর অপর পার থেকে শত শত শত্রু সেনাকে ঘাবড়িয়ে দিতে পেরেছিলাম তা অনেক সময় জনবল ও অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সম্ভব হয়ে উঠে না।

মেজর মোহাম্মদ শামসুল হক

জন্ম : ২ জুলাই ১৯৪৯, কুড়িগ্রাম। শিক্ষা: ফরকেহাট কেরামতিয়া হাই স্কুল, কুড়িগ্রাম এবং কারমাইকেল কলেজ, রংপুর। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্স এবং মাস্টার্স। বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা শেষে ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আর্মি এডুকেশন কোর-এ যোগদান। ২০০১ সালে বয়সের কারণে অবসর গ্রহণ।

মুক্তি সংগ্রামে কুড়িগ্রাম সহ মোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩টি।

বীর উত্তম লে. সামাদ যেভাবে শহীদ হয়েছিলেন

ক্যাপ্টেন (মুজাহিদ) আজিজুল হক, বীরপ্রতীক

মনে হচ্ছে এই তো সেদিন, আমরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করলাম। দেখতে দেখতে ২৯টি বৎসর কেটে গেল। স্বাধীন বাংলাদেশে চোখ দু'টি একটু অন্ধ করলে ভেসে উঠে স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিময় দিনগুলোর কথা। যুদ্ধের প্রতিটি দিন ছিল এক একটি স্মৃতিময় দিন। মনের স্মৃতিতে গাঁথা রয়েছে অনেক কথা, যা এখনও মাঝে মাঝে চোখের সামনে ভেসে উঠে।

১৯৭১ সালের ২০ নভেম্বরের যুদ্ধকালীন সময়ের এমনি একদিনের স্মৃতি—যা আমার মনে আজও দাগ কেটে চলছে। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ৬নং সেক্টরের সাব-সেক্টর সাহেবগঞ্জে হেড কোয়ার্টার মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ব্যাচের ট্রেনিং শেষ করে দু'জন সেকেন্ড লেফটেন্টে যোগ দেয়। তারা দু'জন বয়সে ছিল তরুণ যুবক। দু'জনের পরনে ছিল জিন্সের প্যান্ট, জিন্সের শার্ট। পায়ে ছিল জঙ্গল-সু। একজনের নাম আব্দুল্লাহ্ অপর জনের নাম ছিল সামাদ। লে. সামাদ দেখতে ছিল লালচে ধরনের ফর্সা। তার মুখমণ্ডলে ছিল খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি আর লালচে গোফ। লে. আব্দুল্লাহ্ সাব-হেডকোয়ার্টারে (সাহেবগঞ্জ) থেকে যায়। আর লে. সামাদ সরাসরি ডিফেন্সে চলে আসে। লে. সামাদ ছিলেন অত্যন্ত দূরন্তপনা ও সাহসী যুবক। যুদ্ধকালীন সময়ে আমাদের খাওয়া দাওয়ার ঠিক ঠিকানা ছিল না। হয়তো একই রকমের খাবার একাধিক দিন খেতে হচ্ছে। লে. সামাদের সঙ্গে খেতে বসে দেখেছি তিনি মাছ পছন্দ করতেন না। মাছ খেতে তার বড় কষ্ট হতো। কিন্তু কোনও উপায় ছিল না আমাদের।

খেয়ে না খেয়ে এমনিভাবে কাটতে থাকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো। ১৯৭১ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে চলছে পুরোদমে মুক্তিযুদ্ধ। প্রতিদিনই আমরা কোনও না কোনও অপারেশনে অংশ নিচ্ছি। একটি মজার ব্যাপার হচ্ছে—যুদ্ধের সময় প্রতি রাতে গোলার আওয়াজ না শুনলে সে রাত ভালো ভাবে কাটতে চাইতো না। আমাদের কানে গোলার আওয়াজ আসলেই লে. সামাদ ব্যাংকার থেকে উঠে দেখতো কোথায় গোলা পড়ছে। আমরা বার বার তাকে নিষেধ করতাম—এভাবে দেখা ঠিক নয়। এতে বড় ধরনের বিপদ হতে পারে। এ ধরনের নিষেধ প্রতি উত্তরে (সামাদ) বলতেন গোলা কোথায় পড়ছে ও শব্দ শুনতে খুব ভালো লাগে। আরো বলতেন যুদ্ধে এসে ভয় করলে চলে। যুদ্ধকালীন সময়ে একদিন সকালে আমাদের ব্যাংকারের ২০/২৫ গজ দূরে ৬"

মর্টারের একটি গোলা এসে পড়েছিল। সে সময় আমাদের সবার কান একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের ১২ কিংবা ১৩ তারিখে আমাকে পাঠানো হয় ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন কুড়িগ্রাম জেলাধীন ভুরুঙ্গামারী উপজেলার চৌধুরীর হাটের কাছে সন্তোষপুর নামক জায়গায়। এ এলাকায় অপারেশনের জন্য আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। আমাকে মোটর সাইকেল করে পৌছে দেন সাব-সেক্টরের ডা. মেজর এম. এম হোসেন (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) সাহেবের শ্যালক মুক্তিযোদ্ধা বাবু। ৭১'র নভেম্বর মাস ছিল পবিত্র রজমান মাস। ফলে অনেক মুক্তিযোদ্ধাই রোজা রেখে যুদ্ধ করছিলেন। অনেকে রোজা রাখতে পারে নাই, এ দলের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। যুদ্ধের মধ্যেই রোজা শেষ হয়ে গেল। ১৯৭১ সালের ২০ নভেম্বর ছিল পবিত্র ঈদুল ফিতর। পবিত্র ঈদের দিনটিতে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ঈদের নামাজ পড়ব—এ ইচ্ছা নিয়ে আমি ভারতের সাহেবগঞ্জে আমাদের ক্যাম্পে চলে আসি।

কুচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার সাহেবগঞ্জ ছিল ৬ নং সেক্টরের একটি সাব-সেক্টর। ৬নং সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারীতে।

ঈদের নামাজ পড়ার জন্য আমি সাহেবগঞ্জ এসে জানতে পারি ২০ নভেম্বর ভোরে (ঈদের দিন) সাহেবগঞ্জ সাব-হেডকোয়ার্টারের অদূরে রায়গঞ্জে পাকসেনাদের সঙ্গে সম্মুখ লড়াই হয়েছে। সারা রাত ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রবল গুলি বিনিময় হয়েছে। ঈদের নামাজের জন্য আমরা যখন চূড়ান্তভাবে তৈরি হচ্ছি, ঠিক এমন সময় খবর পেলাম আমাদের এক অফিসার লেফটেনেন্ট সামাদ যুদ্ধের ময়দানে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু তার লাশ আনার জন্য কেউ তার লাশের নিকট যেতে পারছে না। পাক্ সেনারা ক্যানেলের উপারে অবস্থান নিয়েছে এবং মাঝে মাঝে গুলি ছুড়ছে। এরই মধ্যে একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা তরুণ যুবক সম্ভবত তার নাম লুৎফর রহমান, সে তার জীবন বাজী রেখে লে. সামাদের নিহত দেহটি নিয়ে আসল।

ক্রলিং করে লাশের পাশে গিয়ে লে. সামাদের লাশ পিঠে ফেলে নিয়ে আসার পর দেখলাম—দেহের কোথাও গুলি বা আঘাতের চিহ্ন নেই। মাথায় একটি গুলির চিহ্ন পাওয়া গেল। এটাই তার মৃত্যুর কারণ।

লে. সামাদের সঙ্গে একই ব্যাংকারে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এমদাদুল হক খন্দকার (বাবু)। তার নিকট জানতে পারি লে. সামাদের শাহাদৎ বরণের ঘটনা। রায়গঞ্জে যখন ক্যানেলের ওপাশ থেকে খান সেনারা বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়ছে তখন ব্যাংকার থেকে লে. সামাদ ওয়াকিটকি দিয়ে লে. আব্দুল্লাহর নিকট ম্যাসেজ পাঠায়' "আব্দুল্লাহ্ তুমি তোমার টিমকে নিয়ে এ্যাডভ্যান্স কর"। এমন সময় লে. সামাদ ওয়াকিটকি নিয়ে একটু মাথা তুলতেই শত্রুর বুলেট এসে তার মাথায় বিদ্ধ হয়। লে. সামাদ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আর কিছু বলতে পারে নাই। এ কথা বলতে বলতে মুক্তিযোদ্ধা বাবু হাঁউমাউ করে

কাঁদতে থাকে। তিনি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে—আমি আমার এক ভাইকে হারালাম, তার জন্য কিছুই করতে পারলাম না।

লে. সামাদের মৃত্যুতে আমরা সকলেই মর্মাহত হয়ে পড়েছিলাম। ঈদের আনন্দ আমাদের মাঝে শোকে পরিণত হলো। ঈদের নামাজ পড়া আর হলো না। সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর নয়াজেস উদ্দিন সাহেব লে. সামাদের লাশ দাফনের সমস্ত দায়িত্ব আমার উপর দিয়েছিলেন। তখন উক্ত এলাকায় পাক বাহিনীর সঙ্গে গোলাগুলি চলছিল। এলাকার লোকজন ঘর বাড়ি ফেলে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে। ফলে গ্রাম গুলো ছিল জনশূন্য। আমরা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা অনেক খোঁজ করে একজন ইমাম সাহেবকে পেলাম। তিনি জানাযা পড়ালেন। জয়মনিরহাট মসজিদের পাশে লে. সামাদের লাশ কবরস্থ করা হলো। বর্তমান কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলার জয়মনিরহাট মসজিদের পাশে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা লে. সামাদের মাজারটি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন এ কথা আমার মনের স্মৃতিতে ভেসে উঠবে। মুক্তিযুদ্ধে কি কষ্টটাই না করেছি। লে. সামাদের দাফনের জন্য কাফনের কাপড় পর্যন্ত মেলেনি। গোসল ছাড়াই জিন্সের প্যান্ট শার্ট পরিহিত অবস্থাতেই আমরা তার জানাযা শেষে তাকে কবরস্থ করলাম। জানাযা পড়ার আগে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল লে. আব্দুল্লাহ্। তার চোখ থেকে পানি পড়ছে অনবরত। সে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। লে. আব্দুল্লাহ্কে সান্তনা দেওয়ার মতো ভাষা তখন আমার ছিল না। তিনি (আব্দুল্লাহ্) হয়তো ভাবছেন" এক সঙ্গে ট্রেনিং শেষে স্বাধীনতা যুদ্ধে এসেছিলাম, আমি বেঁচে রইলাম আর সহযোদ্ধা আমাকে ছেড়ে চলে গেল।"

লে. সামাদের জিন্সের পকেটে কিছু কাগজপত্র ছিল। সে সব কাগজপত্র লে. আব্দুল্লাহ্ বের করে নিলেন ও লে. সামাদের পা থেকে জঙ্গল-সু জোড়া খুলে নিলেন।

তাকে দাফন করে আমরা নিজ নিজ পোস্টে চলে গেলাম। যুদ্ধ আস্তে আস্তে অগ্রগতির দিকে চলছে। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের ভয়ে হানাদার বাহিনী পালিয়ে যাচ্ছে। কয়েকদিনের মধ্যে কুড়িগ্রাম এলাকা শত্রুমুক্ত এলাকা ঘোষণা হলো। ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর কুড়িগ্রাম স্বাধীন হলো। লে. সামাদের নামে জয়মনিরহাটের নামকরণ করা হলো "সামাদ নগর"।

এভাবে শত মুক্তিযোদ্ধা তরুণের রক্তে আমাদের দেশ ১৬ ডিসেম্বর '৭১-এ স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা পেল। আমরা পেলাম সবুজ জমিনের উপর লাল টুকটুকে সূর্য খচিত পতাকা। এ পতাকায় দেশের মুক্তিযোদ্ধার রক্তে রঞ্জিত হয়ে স্বাধীনভাবে ৩০ বছর ধরে পত পত করে উড়ছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় গোটা বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে যুদ্ধ পরিচালনা হয়েছিল। এর মধ্যে শুধুমাত্র ৬নং সেক্টরের হেড কোয়ার্টারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুক্ত বাংলাদেশের মাটিতে। এলাকাটি লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারীতে। বাকী ১০টি সেক্টরের সকল হেড কোয়ার্টার ছিল ভারতের বিভিন্ন

এলাকায়। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ৬নং হেড কোয়ার্টারটি ছিল শত্রুমুক্ত। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে পাকবাহিনী এ এলাকায় প্রবেশ করতে পারেনি।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানাই যে, একজন শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতিস্বরূপ রংপুর ক্যান্টনমেন্টে একটি স্কুলের নামকরণ করা হয়েছে। "শহীদ লে. সামাদ স্কুল" নামে। কিন্তু, স্বাধীনতার ৩০ বছর পেরিয়ে গেলেও আজও ৬নং সেক্টরে কোনো স্মৃতিসৌধ তৈরি হয়নি। এখানে একটি স্মৃতিসৌধ তৈরি করে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা দেওয়ার জোর দাবী জানাচ্ছি। সে সাথে খেতাব প্রাপ্তদের নামের তালিকাও যেন ৬নং সেক্টরের হেড কোয়ার্টারে স্থান পায়।

ক্যাপ্টেন (মুজাহিদ) মো. আজিজুল হক, বীর প্রতীক

জন্ম : ১ এপ্রিল ১৯৪৫, লালমনিরহাট। শিক্ষা : লালমনিরহাট গভর্নমেন্ট হাই স্কুল। প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে এইচ এসসি পাশ। ১৯৬৫ সালে মুজাহিদ বাহিনীতে ভর্তি। ১৯৬৮ সালে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত। একাত্তরে ৬ নম্বর সেক্টরের সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টরে যুদ্ধ করেন বীরত্বের সাথে। তার সাহসিকতা ও অবদানের জন্য সরকার তাকে 'বীর প্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থেকে কোয়াটার মাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন।

স্মৃতিভরা একাত্তর—নয় নম্বর সেক্টরের কয়েকটি যুদ্ধ

-ক্যাপ্টেন এম নুরুল হুদা

একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে হানাদার বাহিনী 'অপারেশন সার্চ লাইট' নাম দিয়ে অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালায় বাংলার স্বাধীনতাকামী মানুষের উপর। নিরস্ত্র বাঙালি রুখে দাঁড়িয়ে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলো। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধে লাখো প্রাণের বলিদানে দেশ স্বাধীন করেছিলো মুক্তিযোদ্ধারা। স্বাধীনতার কৃতিত্বের সবটুকুই প্রাপ্য বাংলার সাধারণ মানুষের। কারণ মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় সাত হাজার আর গণবাহিনীর সংখ্যা ছিল এক লাখের উপর।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে রণকৌশলগত প্রয়োজনে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। প্রবাসী সরকার কর্নেল এমএজি ওসমানী এমএনএ (মেম্বার ন্যাশনাল এসেম্বলী) কে কমান্ডার ইন চীফ হিসেবে নিয়োগ দেন। বরিশাল, পটুয়াখালী, ফরিদপুরের কিছু অংশ ও খুলনা জেলার কিছু অংশ বাদ দিয়ে সবটা নিয়ে ৯নং নম্বর সেক্টর গঠন করা হয়।

এ লেখাটি এই প্রজন্মের তরুণ বন্ধুদের উদ্দেশ্যে ৯নং সেক্টরের কয়েকটি সশস্ত্র ঘটনাবলী তুলে ধরার প্রয়াস মাত্র। এই সকল ঘটনাবলী তোমাদের এই পৃথিবীতে আগমনের পূর্বের।

একাত্তরের ২০ মার্চ সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী নিয়ে আমি ঢাকা থেকে বরিশালের উদ্দেশ্যে রওনা হই। মানসিকভাবে একটা অশুভ সূচনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। ২৫ মার্চ রাতে অগ্রজ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর এমএনএ আনুমানিক ১১টার সময় এসে বললেন তিনি ঢাকা থেকে ফোনের মাধ্যমে খবর পেয়েছেন পাক হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির স্বাধীনতা হরণ করার জন্য সামরিক অভিযান শুরু করেছে এবং রাজারবাগ, পিলখানা, জগন্নাথ হল ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নির্বিচারে গণতন্ত্রকামী বাঙালিদের হত্যা করছে। তাৎক্ষণিকভাবে সর্বদলীয় রাজনৈতিক সভা ডাকা হয় এবং সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির বেসামরিক প্রধান হিসাবে নূরুল ইসলাম মঞ্জুরকে নির্বাচিত করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা দাবি এই আন্দোলনকে ত্বরান্বিত ও বেগবান করে।

নূরুল ইসলাম মঞ্জুরের নেতৃত্বে আমি ভোর রাতে শহরে উপস্থিত ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের নিয়ে বরিশাল পুলিশ লাইনে যাই। উদ্দেশ্য পুলিশ অস্ত্রাগারের অস্ত্র সংগ্রহ করে পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করবো। স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য না করলেও

নীরব থেকে সাহায্য করেছেন। ভোর নাগাদ পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগারের সমস্ত অস্ত্র আমাদের বাড়িতে এনে জড়ো করা হয়। ওখানে একটিও গুলি রেখে আসিনি। মেজর জলিল অবকাশকালীন ছুটি ভোগ করছিলেন গ্রামের বাড়ি উজিরপুরে। ৭/৮ দিন পূর্বে মঞ্জুর ভাইয়ের কাছে এসে নিজ পরিচয় দিয়ে হানাদার বাহিনীর আক্রমণের আশংকাই প্রকাশ করেছিলেন। আরও বলেছিলেন প্রয়োজনে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তার ঠিকানা রেখে যান। আমি মঞ্জুর ভাইকে বললাম এ সময় মেজর জলিলের খুবই প্রয়োজন। মঞ্জুর ভাই লোক পাঠিয়ে দুপুর ১২টা নাগাদ মেজর জলিলকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসেন এবং সামরিক শাখার প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। আমরা অস্ত্র বিতরণ করি ছাত্র, যুবক ও শ্রমিকদের মাঝে। দুপুর থেকেই স্থানীয় সদর গার্লস স্কুলে প্রশিক্ষণ শুরু করে দেই। মেজর জলিলের নেতৃত্বে পুলিশের ৩০৩ রাইফেল দিয়ে এবং একইসাথে চাঁদমারীতেও অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আমাদের সাথে পরবর্তীতে বাচ্চু ভাই আমার অগ্রজ বাবু ভাই ও পুলিশ লাইনের সুবেদার এবং আনসার প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেন। ২৭ মার্চ লে. মো. নাসিরউদ্দিন আহমেদ ও লে. মেহেদী আলী ইসলাম যোগদান করেন (উভয়ই পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীর প্রশিক্ষণ ও কমিশন প্রাপ্ত অফিসার)।

আমাদের পরিবারের চার ভাই, অগ্রজ নুরুল হক বাচ্চু (Ex-2/LT. PAKISTAN NATIONAL GUARD/CNG 37TH BARISAL BN 1951-1952), নুরুল ইসলাম মঞ্জুর (এমএনএ ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক), অনুজ নুরুল আলম ফরিদ–ছাত্র (সম্পাদক–বিপ্লবী বাংলাদেশ— প্রবাসী মুজীব সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা), আমার মেজ চাচী ডাক্তার সুফিয়া বেগম (তৎকালীন বরিশাল সদর হাসপাতালের লেডী ডাক্তার), আমার সদ্য বিবাহিত জায়া—দিলরুবা রানা ও আমি সকলে মিলে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দীর্ঘ নয় মাস প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হই দেশকে শত্রু মুক্ত ও স্বাধীন করার জন্য।

অগ্রজ মঞ্জুরের পরিকল্পনা অনুযায়ী মেজর জলিল, আমি, ছাত্র আব্দুস সাত্তার কালু (প্রয়াত), বশির আহম্মদ (বেতার অপারেটর–বি-আইডব্লিউটিএ), সেনাবাহিনীর মো. ছিদ্দিক (পরবর্তীতে এমপি) আব্দুল ওয়াদুদ (পরবর্তীতে এমপি) ও আব্দুল জব্বার নদী পথে সুন্দরবন হয়ে ভারতের ২৪ পরগণার হাসনাবাদের পথে রওনা হই। উদ্দেশ্য অস্ত্র সংগ্রহ করে ফিরে এসে দক্ষিণ অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করে দেশকে পাক হানাদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করা। উল্লেখ্য মঞ্জুর ১৭ এপ্রিল একটি ছোট লঞ্চে করে ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ৭২ রিভারাইন ব্যাটালিয়নের মাধ্যমে বেশ কিছু নতুন এসএলআর, এসএমজি হ্যান্ড গ্রেনেড, রকেট লঞ্চারসহ প্রচুর গোলাগুলি নিয়ে আসেন এবং ভবিষ্যতে অস্ত্র সরবরাহের আশ্বাস নিয়ে আসেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড এর কাছ থেকে। ভারতীয় বাহিনীর কাছ থেকে স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র প্রাপ্তির ঘটনা এটাই সর্বপ্রথম। মঞ্জুর মেজর জলিলের কাছে আমাদের জন্য একটি পরিচয়পত্র দেন ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর জন্য।

২৫ এপ্রিল হানাদার বাহিনীর হাতে বরিশাল ও ফরিদপুরের পতন হয়। বরিশালের উপকণ্ঠে তালতলিতে হানাদার বাহিনী হেলিকপ্টারে কমান্ডো নামায়। এ কারণে ছাত্রনেতা কামাল (পরবর্তীতে মেজর কামাল) গুলিবিদ্ধ হন। সদর হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল অফিসার ডা. শাহজাহান (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করেন। আহত মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক নেতাকর্মী, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকসহ প্রায় ১৫০ জনের বাহিনীর সাথে মঞ্জুর ভাইয়ের পরিবার, লে. নাসিরের পরিবার ও আমার স্ত্রীকে নিয়ে মঞ্জুর ভাই সুন্দরবন হয়ে ভারতের হাস্‌নাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং পৌছায় ২৯/৩০ এপ্রিলে। তখন আমি ও মেজর জলিল বনগাঁও-এর সীমান্তে মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর ক্যাম্পে অবস্থান করছিলাম, তাঁর কাছ থেকে হালকা অস্ত্র, গোলাবারুদ ও মর্টার সংগ্রহ করার জন্য। ঐ সময়ে ভারতীয় হাসনাবাদ থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত সীমান্তের প্রহরী হিসেবে কর্তব্যরত ছিলেন লে. কমান্ডার মুখার্জী, অধিনায়ক বিএসএফ ৭২ এনবি। তিনি বেশ ধৈর্য্য সহকারে মেজর ওসমানকে বুঝাতে সক্ষম হন যে তার অস্ত্র ভাণ্ডার (ইপিআর-এর যে সমস্ত অস্ত্র নিয়ে সর্বপ্রথম ভারতে পৌছান) থেকে আমাদের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করলে আমরা দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারব। অবশেষে মেজর ওসমান রাজি হন প্রচুর হালকা অস্ত্র দিতে। এর মধ্যে ছিল চাইনিজ রাইফেল, ৩০৩-রাইফেল স্টেনগান, ২´´ মর্টার, ৩´ মর্টার ও হ্যান্ড গ্রেনেড। উল্লেখ্য তিনি আমাদের একটি চাইনিজ এলএমজি দেন। এখানে বীরযোদ্ধা হাফিজ ক্যা. শফিউল্লাহ ও বেসামরিক দুইজন তরুণ অফিসারের সাথে দেখা হয়। এরা হলেন ঝিনাইদহ মহকুমা প্রশাসক জনাব তৌফিক এলাহী চৌধুরী ও পুলিশ অফিসার মাহবুব উদ্দিন আহমেদ। সবাই আমার পূর্ব পরিচিত ছিলেন। এরা সবাই দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে সাহসিকতার সাথে অংশগ্রহণ করে বীরযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পান এবং বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত হন।

মে মাসের ২০-৩০ তারিখ ৯নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয় টাকীতে ইয়ুথক্যাম্প টাকিপুরে এবং গেরিলা ইনডাকশন ক্যাম্প স্থাপন করা হয় বাকুন্ডিয়ায়। পরিবার বর্গের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয় হাস্‌নাবাদ গঞ্জের একটু দূরে। এসব ব্যাপারে লে. কমান্ডার মুখার্জী ও ক্যাপ্টেন বিশ্রাম সিং বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মিত্র বাহিনীর ইস্টার্ণ কমান্ড-এর উপর ৯নং সেক্টর এর সার্বিকভাবে দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। 'চার্লি সেক্টর' কমান্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার এমএ সালিক। এদের সাথে আলাপ করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলাদের দেশের অভ্যন্তরে নিরাপদ স্থানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সুন্দরবনের গহীন অরণ্য পথ গেরিলাদের জন্য নিরাপদ ছিল। আমাদের দায়িত্ব দেয়া হয় এসব জায়গা মুক্ত রাখার। সেই লক্ষ্যে সাতক্ষীরা মহকুমার দেবহাটা, কালীগঞ্জ ও শমসের নগর থানার সমস্ত সীমান্ত চৌকিসমূহে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ওদের দাবিয়ে রাখা এবং সম্ভব হলে তাড়িয়ে বেড়াতে হবে এই নির্দেশ দেওয়া হয়। ভারতীয় সীমান্ত হিংগলগঞ্জে আক্রমণ ঘাঁটি স্থাপন করা, পরিকল্পনা ও আক্রমণ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে। হিংগলগঞ্জের দূরত্ব হাস্‌নাবাদ থেকে ১২

মাইল। মাটির পথ, প্রমত্তা ও খরস্রোতা কালিন্দি নদী ও ইছামতি নদী পার হয়ে যেতে হয়।

৪ জুন প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির মাঝে রওনা হলাম ৩৫ জন তরুণ যোদ্ধা নিয়ে, হাতিয়ার দেওয়া হলো বিশটি ৩০৩ রাইফেল, চল্লিশটি হ্যান্ড গ্রেনেড, দুইটি ২˝ মর্টার ও আমার সাথে চীনা এসএমজি। রাত ১১টার দিকে ক্যাম্প-এ গিয়ে পৌছালাম। একটা স্কুল মাঠের শেষ প্রান্তে ৪টা তাঁবু (ত্রিপলের তৈরি) টানানো, সব আয়োজন বিএসএফ করে রেখেছিল। চারিদিকে পানি সেই সাথে উপর থেকে অঝোরে বৃষ্টির পানি পড়ছে দেখে সাথীরা নিরাশই হলো। যাহোক পরের দিন স্থানীয় বিএসএফ কমান্ডার ক্যাপ্টেন পান্ডে-কে অন্য জায়গায় দেয়ার অনুরোধ করলাম। পান্ডে আশ্বাস দিলেন।

কালীগঞ্জ ও শ্যামনগর থানার নেতৃস্থানীয় কলেজ ছাত্র ও যুবকরা ইতোমধ্যে আমার সাথে যোগদান করে। এদের মধ্যে শেখ ওয়াজেদ, শেখ আতাউর, নাসির, বারেক, আকবর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

তাদের দিয়ে খান্‌জি, বসন্তপুর, রতনপুর, কালীগঞ্জ, শ্যামনগরে অবস্থিত হানাদার বাহিনীর সব সীমান্ত চৌকির অবস্থান, শত্রু সংখ্যা ও রেশন সরবরাহের দিনসহ বিস্তারিত খবর সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যাই। ওদের উপস্থিতিতে স্থানীয় যুবক ও ছাত্ররা এসে আমার সাথে যোগাযোগ করেন। পরবর্তীতে আমাদের সাথে আটশত হতে এক হাজার জন মুক্তিযোদ্ধার সমাবেশ হয়।

প্রথম দিকে আমরা রাতে নদী পেরিয়ে সীমান্ত চৌকি থেকে কিছু দূরে Anti personal mine পুঁতে ভোর হবার পূর্বেই এপারে ফিরে আসতাম। হানাদার বাহিনী যখন টহল দিত তখন মাইনের আঘাতে ধরাশায়ী হত। ক্রমেই ওরা টহলের পরিধি কমিয়ে দেয়। ওরাও সীমান্ত চৌকি এর চারিদিকে মাইন বসিয়ে যায়। এটা জানতে পেরে আমরা ফিল্ডের উপর গরু ছাগল চরানোর জন্য রাখালদের বলতাম যাতে করে, মাইন চিহ্নিত করতে সুবিধা হয়। এ ব্যাপারে লে. বেগ (এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট নেভাল কমান্ডো) সর্বদা সাহসী ভূমিকা পালন করতেন। এরপর সিদ্ধান্ত নিলাম হানাদার বাহিনীর দুর্বল ঘাঁটি আক্রমণ করার। আমি ৫ জুন দেবহাটা থানার খান্‌জি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেই। এটা ছিল আমাদের প্রথম যুদ্ধ।

ঐ দিন ছিল বেশ মেঘলা। সন্ধ্যার পর বৃষ্টি শুরু হলো। তখন কালিন্দি নদী বেশ উত্তাল। মাঝ রাতে আমরা তিন দলে বিভক্ত হয়ে নদী পার হই। এক দলের নেতৃত্বে ছিলেন লে. মাহফুজ আলম বেগ, আরেক দলের নেতৃত্বে সুবেদার গফুর এবং মূল দলের দায়িত্বে ছিলাম আমি। ভোর ৩-৩০ মি. এ আমরা ২˝ মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ করি। দশ মিনিট ধরে গোলাবর্ষণ শেষে আমরা অগ্রসর হই, ২০০-২৫০ গজের মধ্যে গিয়ে ত্রিমুখী এলএমজির গুলিবর্ষণ করি। হানাদার বাহিনী ঐ গুলির মাঝে বাংকারে-এ পজিশন নিতে না পারায় ওদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ দুর্বল হয়ে পড়ে। ওরা ক্যাম্পের ভিতর থেকে এলোপাথাড়ি গুলি ছোঁড়াছুড়ি করে। তাছাড়া সন্ধ্যার পর ওরা বাইরে বের হতো না। ঠিক ভোর চারটায় ত্রিমুখী আক্রমণ করে 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে আমরা সীমান্ত চৌকি এর

দিকে ধাবিত হয়ে হ্যান্ড গ্রেনেড চার্জ করি। ওরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চারিদিকে ছুটে যায়। অন্ধকার রাত হওয়ায় ফসলের মাঠে লুকিয়ে পড়ে। এখানে ওদের গুলিতে আমাদের একজন আহত হয়। সবুজ সংকেত দিয়ে আমরা ক্যাম্পের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। হানাদার বাহিনীর দুই জন মৃত ও পাঁচ জন আহত অবস্থায় পাই। এখানে প্রচুর অস্ত্র যেমন হালকা মেশিন গান, চাইনিজ রাইফেল, হ্যান্ড গ্রেনেড ও বারুদ পাই। এই অস্ত্র আমাদের মনোবল ও আস্থা বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া ওখানে ৩০/৪০ জনের এক মাসের রেশন পাই। ভোর ৪.৩০ মি. নাগাদ 'জয় বাংলা'র পতাকা উত্তোলন করে অস্ত্র, রেশন ও আহত বন্দীদের নিয়ে মূল ঘাঁটিতে ফিরে আসি। আহত বন্দীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে স্থানীয় বিএসএফ এর হাতে তুলে দেই। জুন-জুলাইতে সীমান্ত চৌকির উপর নিয়মিত আক্রমণ চালাই।

২০ আগস্ট পরিকল্পনা মতো শ্যামনগর থানা সদর আক্রমণ ও দখল নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। স্থানীয় যোদ্ধাদের মারফত নিয়মিত শত্রুপক্ষের অবস্থানের উপর দৃষ্টি রাখি ও তথ্য সংগ্রহ করি। শ্যামনগর সীমান্ত—নদীর তীর থেকে ৬/৭ মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত। তদুপরি কালীগঞ্জ ওদের স্থানীয়-মূল ঘাঁটি। ওখান থেকে সড়ক পথে ওরা নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে। ২০ আগস্ট মাঝরাতে নদী পার হয়ে রতনপুর থেকে এক গ্রুপ এবং ধলবাড়িয়া থেকে আরেকটা গ্রুপ রওনা হই। ৩য় দল দুদলিতে গিয়ে কালীগঞ্জ-শ্যামনগর সড়ক অবরোধ করে রাখে। ওখানে আমাদের সাথে একশত বিশ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। আক্রমণ পরিচালনায় লে. বেগ, সুবেদার ইলিয়াস, সুবেদার গফুর, হাবিলদার সোবহান ও মোকাররম যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার ও সাহসিকতার পরিচয় দেন।

শমসের নগরের যুদ্ধে আরও অংশ নেন প্রয়াত চিত্রগ্রাহক মুহম্মদ আলম। ভোর ৪টায় আমার ২" মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করি। মূল বাহিনী নিয়ে দক্ষিণ দিক দিয়ে রতনপুর হয়ে আমি অগ্রসর হই। লে. বেগ উত্তর দিক দিয়ে অগ্রসর হয়। দশ মিনিট গোলাবর্ষণ করার পর উভয়েই দল নিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু হানাদার বাহিনীর লাগাতার গুলির সামনে আমাদের থমকে যেতে হয়। ওদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটি খুব মজবুত। ওরা ওয়াপদা কলোনীর সম্মুখভাগের দেয়ালের বাইরে ও পরিখার মধ্যে অবস্থান নিয়েছিলো এবং দেয়াল ভেঙে মূল ঘাঁটির সাথে যোগাযোগ রাখছিলো। ওদের নির্গমন পথও ঐ দিকেই ছিলো। আমরা উভয় দল আক্রমণ বন্ধ রেখে সময় নিয়ে মর্টারের গোলা ওদের ব্যাঙ্কারের উপর ছোড়ার নির্দেশ দেই। শমসের নগর কালীগঞ্জ সড়কের উভয় পাশে ধান ক্ষেত এবং বর্ষার কারণে বেশ পানি ছিলো। সুবেদার ইলিয়াস ও হাবিলদার সোবহানের নেতৃত্বে দশ জন করে দুই দলে বিশ জন মুক্তিযোদ্ধাকে এলএমজি, হ্যান্ড গ্রেনেড ও রাইফেল নিয়ে ধান ক্ষেতের ভিতর থেকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেই যাতে করে সূর্য ওঠার পূর্বে বাঙ্কারের নিচে পৌঁছাতে পারে। ওয়াপদা কলোনীর দক্ষিণ ও উত্তর দিকে ধানক্ষেত আর জলাশয় হওয়াতে ওদের গোলাগুলি নিক্ষেপের সীমাবদ্ধতা ছিল। সেজন্য একমাত্র সড়ক বরাবর তারা গোলাগুলি করেছে।

ভোর ৫/৫.৩০টা নাগাদ দুই দলই বাঙ্কারের নিচে পৌঁছে যায় এবং আমাদের মর্টার

ফায়ার বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই মুক্তিযোদ্ধারা নিজ নিজ সম্মুখবর্তী পরিখার ভিতরে গ্রেডেন ছুড়ে মারে। পরিকল্পনা অনুযায়ী দুই দলের ৪ জন এলএমজি নিয়ে অতর্কিত গুলিবর্ষণ শুরু করে। এই সময় আমি এবং লে. বেগ উভয় দিক দিয়ে অগ্রসর হতে থাকি 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে। হানাদার বাহিনী সম্মুখবর্তী প্রতিরক্ষা অবস্থান ছেড়ে কলোনীর মধ্যে মূল দলের সাথে অবস্থান নেন। আমরা ৩/৪ দলে ভাগ হয়ে কলোনীর ভিতর ঢুকে পড়ে গোপন অবস্থান নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেই। উভয় দল রাস্তার ঢালু পথ ধরে সামনে এগুতে থাকি এবং আমাদের পিছন থেকে বিরতি দিয়ে মর্টারের গোলাবর্ষণ করার নির্দেশ দেই। ইতোমধ্যে বেশ বেলা হয়ে যায়, ধানক্ষেতের মধ্য থেকে অগ্রবর্তী দলের সাথে যোগযোগ রক্ষা করে চলি; ওদের উপর নির্দেশ দেই বেলা ১২ টা নাগাদ ওদের অবস্থান থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করার। আড়াল থেকে এবং আমরা কলোনীর কাছাকাছি পৌছালে সবুজ সংকেত দেবো এবং তারা নিজ অবস্থান থেকে খুব উচ্চস্বরে 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিবে অন্তত তিনটা জায়গা থেকে, পাঁচ মিনিট গুলি ছুড়বে ছেড়ে ছেড়ে, কিন্তু কোনভাবেই আড়াল থেকে বাইরে আসবে না ২য় সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত। বেলা ১১ টা নাগাদ আমরা উভয় দলই কলোনীর খুব কাছে পৌছে যাই এবং একই সাথে ধাবিত হই। নির্ধারিত সময় কলোনীর ভিতর দিয়ে গুলির শব্দ ও জয় বাংলার ধ্বনি শুনে ওরা ভীত হয়ে পড়ে এবং হঠাৎ করে সড়কের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কলোনীর ভিতর ঢুকে পড়ে শত্রু খুঁজে বের করার জন্য। আমরা এই সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম। দ্রুতবেগে গুলি ছুড়ে ঢুকে পড়ি কলোনীর ভিতর। হানাদার বাহিনী দিশেহারা হয়ে দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত কৈখালীর দিকে ছুটতে থাকে। ওদের এলোপাথাড়ি গুলি আমাদের অগ্রযাত্রাকে থামাতে পারেনি। আমাদের তিন দিকের আক্রমণের ফলে ওরা ঘাঁটি ছেড়ে দেয়। বেলা ১২টা নাগাদ আমরা ওদের পিছু না নিয়ে কলোনী দখল করে নেই এবং নিজ নিজ অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করি। এখানে আহত অবস্থায় দুই জনসহ মোট ছয় জনকে বন্দি করি। বিকেল চারটায় থানা কম্পাউন্ডে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করি। স্থানীয় জনসাধারণের সাথে কথা বলি এবং সার্বিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। রাত আনুমানিক দশটার দিকে লে. বেগের উপর সার্বিক দায়িত্ব দিয়ে সীমান্তের ওপরে বাকুডার মূল ঘাঁটির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে মাঝ রাত নাগাদ পৌছে যাই।

২১ আগস্ট-এর শেষ রাতে হানাদার বাহিনী স্থানীয় ঘাঁটি কালীগঞ্জ থেকে সড়কপথে এসে শ্যামনগর আক্রমণ করে। ওদের সংখ্যা ছিলো আনুমানিক দুইশত। এই আক্রমণে ওরা জিপ, ট্রাক, মেশিনগান, রিকয়েললেস রাইফেল ব্যবহার করে।

আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা ছিল খুবই পরিশ্রান্ত এবং সম্ভবত অসতর্ক। এই আক্রমণের জন্য আমাদের চরম মূল্য দিতে হয়। এই সংঘাতে দুই জন গ্রামবাসী, সুবেদার ইলিয়াস সহ মোট ছয় জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন ও ছয় জন মুক্তিযোদ্ধাকে পাক হানাদার বাহিনী বন্দি করে। হেভিমেশিনগানের গুলি ও তার গোলাবর্ষণ এর সাথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা পরিচিত ছিল না, যার ফলে তীব্র ও প্রচণ্ড গোলাগুলির সামনে টিকে থাকতে পারেনি।

লে. বেগ রতনপুর হয়ে পিছনে হটে আসেন। বেলা ৭টা নাগাদ বিএসএফ এর লোকেরা হানাদার বাহিনীর বেতার বার্তা পথিমধ্যে রোধ (intercept) করে জানতে পারে হানাদার বাহিনী শ্যামনগর পুনঃদখল করেছে ও অনেককে বন্দি করে নিয়ে গেছে। তারা এ খবর আমাকে জানায়। আমি বিএসএফ এর সহযোগিতায় কিছু যোদ্ধা নিয়ে দিনের বেলায় নদী পার হয়ে লে. বেগের সহায়তার জন্য ছুটে যাই এবং আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সবাইকে পুনঃসংগঠন করে বাকুডা ক্যাম্পে ফিরে আসি। ঐ দিন দুপুর থেকে পাক রেডিওতে নিউজ-বুলেটিন বিরতিহীন প্রচার করছিল শ্যামনগর পুনঃ দখলের বার্তা। ওরা বন্দিদের কাছ থেকে আমাদের নাম জানতে পারে, এবং বারবার প্রচার করে যে আমরা আহত অবস্থায় বন্দি হয়েছি। ওরা আমাদের ভারতীয় দুষ্কৃতিকারী ও দালাল বলে আখ্যায়িত করে ও আমাদের শ্যামনগর অভিযান সম্পর্কে হানাদার নিয়ন্ত্রিত 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় ২২ আগস্ট কাল্পনিক খবর প্রকাশ করে।

অল্পদিনের মধ্যেই আমরা শ্যামনগর ও কালীগঞ্জ থানার অধিকাংশ স্থান পুনঃদখল করি, এবং নদীপথ মুক্ত করে সুরক্ষণ করি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলাদের জন্য। আমাদের সুরক্ষিত পথে ১৫ আগস্ট নৌ-কমান্ডাররা চালনা ও মংলা আক্রমণ করেন। ২০ নভেম্বর ঈদুল ফিতরের দিনে আমরা কালীগঞ্জ মুক্ত করি। কালীগঞ্জ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম ডাকটিকেট চালু হয়।

৭ ডিসেম্বর সাতক্ষীরা মহকুমা সদরে আমরা স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করি। ১৭ ডিসেম্বর খুলনা মুক্ত হয়। ঐ দিন বিকেল ৪টায় খুলনা সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে মিত্র বাহিনীর ৯ ইনফ্রান্ট্রি ডিভিশনের কমান্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল দলবীর সিং এর নিকট আত্মসমর্পণ করে পাক বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার মালিক হায়াত খান কর্নেল ও হানাদার বাহিনীর অন্যান্য অফিসার বৃন্দ।

আমাদের সন্তানরা আজ তোমরা স্বাধীন বাংলাদেশে বাস করছো। মনে রেখো বহু বীর যোদ্ধার বীরত্বের ও আত্মত্যাগের উপহার আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশ।

ক্যাপ্টেন এম নুরুল হুদা

জন্ম : ২ নভেম্বর ১৯৪১, বরিশাল। শিক্ষা : বরিশাল বিএম স্কুল, বিএম কলেজ, বরিশাল। প্রাইভেট পরীক্ষায় বিএ। ২ জুলাই ১৯৬৬ তে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এ নিয়োগ পান। ১৯৬৩ সালে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও মিছিল করায় দুইবার কারাবরণ। কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ১৯৬৯ সালে চাকরি থেকে অব্যাহতি প্রদান। মুক্তিযুদ্ধে নয় নম্বর সেক্টরের একজন সাব-সেক্টর কমান্ডার এবং সম্মুখ সমরের সৈনিক।

চাঁদপুর অঞ্চলে প্রতিরোধ যুদ্ধ
প্রকৌশলী মো. দেলোয়ার হোসেন

"হিমালয় থেকে সুন্দর বন হঠাৎ বাংলাদেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে
সে রুদ্ধস্বরের আমি পাই উদ্দেশ।"

এই হচ্ছে কবি সুকান্তের বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশ আমার হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনের দৃপ্ত অহংকার। আমি বাঙালি, শত সহস্র বছরের অত্যাচার অবিচার আর শোষণের বিরুদ্ধে চলছে আমার নিরন্তর যুদ্ধ। যে যুদ্ধ যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে কখনও শক, হুন, মোগল, পাঠান ও সাগর পাড়ের বেনিয়া ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে, কখনও তাদের এ দেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে। সর্বশেষ আমরা লড়েছি পাকিস্তানি হায়েনাদের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানি হানাদাররা ২৩টি বছর ধরে আমাদের পদাবনত করে রেখেছিলো। হানাদার পাক-সমরনায়কদের হাত থেকে অধিকৃত ভূমি পুনরুদ্ধারে তথা প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতার সংগ্রামে যখন সমগ্র বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ, তখন চাঁদপুরের জনগণও এর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেনি। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে আসন্ন যুদ্ধের জন্য তারাও তৈরি হতে থাকে। চাঁদপুরের বিভিন্ন গ্রামে, ইউনিয়নে, থানায় থানায়, ২৫ মার্চের অনেক পূর্বেই দেশপ্রেমিক সংগঠনগুলো গোপনে গোপনে সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তুলেছিলো। প্রতিরোধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ার পূর্বক্ষণ সেই অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোতে গোপনে গোপনে দেশী হাতিয়ার ও বোমা তৈরি করেছে চাঁদপুরের ছাত্র-শ্রমিক। এরূপ একটি সংগঠনের বোমা তৈরির সময় বোমা বিস্ফোরণে চাঁদপুরে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী শাহাদাৎবরণ করেছিলো। তাঁরা হলেন— শহীদ আবুল কালাম, শহীদ আব্দুল খালেক, শহীদ সুশীল, শহীদ শংকর। চাঁদপুর ট্রাকরোড বালুর মাঠের পাশে বর্তমানে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে। সেই সৌধের স্মৃতিফলক আজো চাঁদপুরের জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেয় তাদের মহান আত্মত্যাগের কথা। সেটি ছিল ৩ এপ্রিল ১৯৭১।

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সমগ্র জাতি তখন ঐক্যবদ্ধ। চাঁদপুর মহকুমা সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতা, কর্মীরাও স্বাধীনতার আন্দোলনে তৎপর হয়ে ওঠে। তাদের উদ্যোগে চাঁদপুর নতুনবাজার বালির মাঠে কাঠের রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, আওয়ামী লীগ, ন্যাপের নেতা কর্মীদের মধ্যে অনেকেই এই সংগ্রামে সরাসরি জড়িত হন। এই মুহূর্তে যাদের নাম মনে পড়ছে তারা

হলেন—রবিউল আওয়াল কিরণ (পরবর্তী সময়ে এমপি), আব্দুল মোমেন মাখন, আবু তাহের দুলাল, মনিরুল হক, আব্দুল আজিজ (সক্‌দি রামপুর), ওয়াহিদুর রহমান (কচুয়া), হানিফ পাটওয়ারী, মজিবুর রহমান, সৈয়দ আবেদ মনসুর, খসরু (নাজির পাড়া), আব্দুল মোমেন (ছোট সুন্দর), আব্দুল লতিফ, চন্দন পোদ্দার প্রমুখ। তাদের সহযোগিতায় শ্রমিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরাও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আছে। তাদের নেতৃত্বে চাঁদপুরের বিভিন্ন অবস্থানে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে ওঠে। ছাত্র নেতাগণ চাঁদপুর শহর সহ মহকুমার বিভিন্ন ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, যুব শক্তিকে একত্রিত করে আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্যবৃন্দ; ছুটি ভোগরত বাঙালি সেনাসদস্যগণ এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ফ্লাইট লে. (অব) এবি সিদ্দিক এমপি এর নেতৃত্ব দেন।

চাঁদপুর মহকুমার তিনটি থানার মোড়ে অবস্থিত (হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর ও ফরিদগঞ্জ) অলিপুর গ্রামে ১৭ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোলন্দাজ শাখার দুর্ধর্ষ সেনা, তৎকালীন হাবিলদার আ. সাত্তার অলিপুর গ্রামে ৩০ জন ছাত্র, কৃষক, ছুটি ভোগরত সেনাসদস্যদের নিয়ে একটি গেরিলা দল গঠন করেন। ঐতিহাসিক অলিপুর দিঘীর পাড়ে তিনি ছাত্র-শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। এই দলটিতে পরবর্তী পর্যায়ে অনারারী ক্যাপ্টেন আ. গফুর, (তৎকালীন সময়ে হাবিলদার) নায়েক মোস্তফা কামাল, হাবিলদার হাফেজ মিয়া যোগ দেন। তৎকালীন সুবেদার পরে অনারারী ক্যাপ্টেন জহিরুল হক পাঠান ১০ এপ্রিল এই দলটির অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই দলটির বিস্তৃতি ঘটার পর মে মাসের শেষ দিকে এর নাম হয় বিখ্যাত মধুমতি কম্পানি। আজিম, দেলোয়ার হোসেন, তরিক উল্লাহ পাঠান এই দলের প্রাথমিক পর্যায়ের মুক্তিসেনা ছিলেন। চাঁদপুর মহকুমার মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিলো অত্যন্ত সামরিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে মহকুমা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে। মহকুমা সংগ্রাম কমিটি ছাড়াও সমগ্র মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে অন্য যারা সক্রিয় ছিলেন, তাদের মধ্যে আব্দুল মান্নান বি-এস-সি, আব্দুর রব বি-এস-সি, হাবিলদার রশিদ, আবদুর রব শেখ, আমিনুল হক মাস্টার, মাওলানা হাফেজ আহম্মদ, তৎকালীন হাজিগঞ্জ বড় মসজিদের ইমাম এবং তাদের সহযোগী অসংখ্য নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ করার মতো। সুবেদার জহিরুল হক পাঠানের নেতৃত্বে মধুমতি তথা চাঁদপুর কম্পানি দেশ শত্রুমুক্ত হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো। তৎকালীন সময়ে চাঁদপুর মহকুমা মুক্তিফৌজ কমান্ডার সুবেদার জহিরুল হক পাঠানের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীও চাঁদপুর মহকুমাবাসীর নিকট নির্ভরতার প্রতীক ছিল। এখানে একটি কথা না বললেই নয় যে, স্বায়ত্বশাসনের জন্যে নির্বাচিত একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের জন প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণে ইয়াহিয়া খানের টালবাহানা সে সময় বাংলার জনগণকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার জন্যে ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছিলো। যতই সময় গড়িয়ে যাচ্ছিল জনতার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছিল, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছিল সামরিক সরকারের। প্রকৃত অর্থে একটি সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ বলতে যা বোঝায় সে হিসেবে লাঠিসোঠার সমাবেশ গুরুত্বহীন হলেও জনতার মাঝে

গড়ে ওঠা জাতীয় ঐক্য প্রকৃত আসন্ন মুক্তিযুদ্ধের নিয়ামক শক্তি হিসেবে প্রতিভাত হয়ে উঠছিল। একটি মুক্তিযুদ্ধের আবহ সৃষ্টি হলেও সে সময় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের যুদ্ধ সংঘটিত করতে খানিকটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন। ফলে আঘাত যখন এলো, তখন নেতৃবৃন্দ পরস্পরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, সত্যিকার অর্থে তখন যদি ত্যাগী বাঙালি সৈনিকরা রুখে না দাঁড়াতো তাহলে কার্যকর প্রতিরোধ বিলম্বিত হতো। বর্বর পাক সেনারা দেশটাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতো। সে প্রেক্ষাপটে চাঁদপুর অঞ্চল ও সমগ্র দেশ থেকে আলাদা ছিলো না।

চাঁদপুর অঞ্চলে সংগঠিত মুক্তিযুদ্ধ দেশের অপরাপর অঞ্চলে গঠিত একই ধারায়, অর্থাৎ ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, পাক-বাহিনী ত্যাগকারী সেনা সদস্য ইপিআর, পুলিশ তথা সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে থেকে উঠে আসা লোকদের দ্বারাই স্বতঃস্ফুর্তভাবে সংগঠিত হয়েছিল। সবশ্রেণীর মানুষের সমন্বয়ে গঠিত গণবাহিনী যুদ্ধটি বিজয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়োছিলো। চাঁদপুর অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধ কোনো রাজনীতি বহির্ভূত বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিলো না। একটি কথা অনস্বীকার্য, যুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দিলেও ন্যাপ (ভাসানী) ন্যাপ (মুজাফ্ফর) সহ বামপন্থী নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে তাদের ছাত্র- শ্রমিক সংগঠনের তরুণ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলো।

২৫ মার্চ কালো রাতের আগেই নরিংপুর, টোরাগড়, অলিপুর গ্রামের মতোই তৎকালীন চাঁদপুর মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের আহ্বানে ছাত্র-যুবকরা সংগঠিত হতে শুরু করেছিলো। ২৫ মার্চ কালো রাতে পাক সেনাবাহিনীর বর্বর হামলা ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড, লুঠ, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, সীমাহীন অত্যাচার ক্ষণিকের জন্যে বাঙালি জাতিকে হতচকিত করলেও তারা ফিরে দাঁড়ায়। অপ্রত্যাশিত ধ্বংসযজ্ঞের কারণে ক্ষণিকের জন্যে বাঙালি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলো সত্যি কিন্তু ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে এক তরুণ বাঙালি সেনানায়ক বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। সম্বিৎ ফিরে পায় হতদ্যোম বাঙালিরা। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্যে, অপমান আর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে বাঙালি তরুণরা ঘুরে দাঁড়ায়। ১৯৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে তরুণ সেনানায়ক মোহনলালের কণ্ঠ যেন দুই শতাব্দী পর পুনরায় বাতাসে ভেসে আসে। সারা বাংলার প্রতিটি ঘরে তরুণরা সংকল্পবদ্ধ হয়। সে মাহেন্দ্রক্ষণে মেজর জিয়ার বিপ্লবী কণ্ঠের উদাত্ত আহ্বান সে এক বিস্ময়কর যুদ্ধ শুরুর শুভযাত্রা বলা যেতে পারে। পাক আর্মি ত্যাগকারী বাঙালি সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌ-বাহিনীর সৈনিকসহ তৎকালীন ইপিআর ও পুলিশের সদস্য, ছাত্র ও যুবক শ্রেণী সেদিন নিশ্চিত মৃত্যুকে পরিণতি জেনেও স্বাধীনতার পতাকা সমুন্নত রেখে বিজয় ছিনিয়ে আনার মানসে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। প্রতিদিন ঘটতে থাকে বিস্ময়কর ঘটনাসমূহ। প্রথমদিকে পাক সেনাবাহিনীতে কর্মরত চাঁদপুর অঞ্চলে প্রচুর দক্ষ সৈনিক ছিলো। কিন্তু অস্ত্রের মধ্যে ছিল দু'চারটি পাখি শিকারী বন্দুক, ভোঁতা রাইফেল, যুদ্ধ করার মতো তেমন কোনো হাতিয়ার ছিলো না। মুরগির রক্ত গায়ে মেখে মামলা রুজু করার কৌশলে

হাজিগঞ্জ থানায় গিয়ে কৌশলে পুলিশদের ডিজআর্ম করে ৬টি রাইফেল; একটি পিস্তল, ২৬৫ রাউন্ড রাইফেলের গুলি সংগ্রহ করা হয় এবিএম কলিমুল্লাহ্ ও হাবিলদার সাত্তারের নেতৃত্বে। এরপর গেরিলা কায়দায় একজন পাকসেনাকে মেরে তার কাছ থেকে প্রচুর গুলি ও দুটি চাইনিজ রাইফেল উদ্ধার করে সদ্য গঠিত মুক্তিসেনারা।

পরবর্তী সময়ে কুমিল্লা সীমান্ত চৌকি থেকে পাক-সেনাদের আক্রমণে টিকতে না পেরে একটি ইপিআর দল আহত ও ক্লান্ত অবস্থায় চাঁদপুর অঞ্চলের হাজিগঞ্জ থানার রাজারগাঁও শ্রীপুর গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের নিকট থেকে দুটো হাল্কা মেশিনগান, রাইফেল ও ৫ হাজার গুলি পাওয়া যায়। এই অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে গড়ে উঠেছিল চাঁদপুর অঞ্চলের প্রথম মুক্তি সেনা দল। মধুমতি কম্পানী হিসাবে যা খ্যাতির শীর্ষে স্থান পেয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে ই পি আর'দের নিকট থেকে সংগ্রহ করা অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়েই যুদ্ধ শুরু করেছিল মধুমতি কম্পানী।

৪ এপ্রিল চাঁদপুর শহর শত্রু সেনারা আকাশ ও স্থল পথে আক্রমণ করে দখল করে নেয়। জনতার প্রথম প্রতিরোধ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু মুক্তি সংগ্রামীরা অতিদ্রুত প্রথম আঘাত সামলে নেয়। পুনরায় ফরিদগঞ্জ থানার পাইকপাড়া নামক স্থানে তারা সমবেত হতে শুরু করে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগকারী ও ছুটি ভোগরত সেনাসদস্যবৃন্দ পাইকপাড়ায় আসতে থাকে। সুবেদার জহিরুল হক পাঠান দায়িত্ব নেয়ার পূর্বে নায়েব সুবেদার আবদুর রব পাইক পাড়ায় সেনা সদস্যদের নিয়ে দলটি পুনর্গঠন করা শুরু করেছিলেন। জহিরুল হক পাঠান ১০ এপ্রিল পাইকপাড়ায় আসেন। তিনি সমবেত সকল সশস্ত্রবাহিনীর সদস্য, স্বাধীনতাকামী ছাত্র, শ্রমিক ও উৎসাহী গ্রামবাসীকে সামরিক কানুন অনুযায়ী, সেকশন, প্লাটুন, কম্পানীতে সাজানোর কাজ শুরু করেন। পাঠান মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সুদৃঢ় প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসেন। পাইকপাড়ায় তখন ৩৫০ জনের মতো ছাত্র শ্রমিক প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছে। এসব কাজে বে-সামরিক যোদ্ধাদের মধ্যে কলিম উল্লাহ ভূঁইয়া ছিলেন অন্যতম। উপস্থিত সামরিক, বে-সামরিক নেতৃবৃন্দের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সুবেদার জহিরুল হক পাঠান নব গঠিত বাহিনীর আওতাধীন এলাকাকে ৫টি অঞ্চলে ভাগ করেন।

অঞ্চল (ক) : রামগঞ্জের পূর্ব অংশ, হাজিগঞ্জ, নোয়াখালী ও লাকসামের কিছু অংশ, কমান্ডার- নায়েব সুবেদার আলী আকবর পাটওয়ারী।

অঞ্চল (খ) সমগ্র মতলব থানা, কমান্ডার– নায়েব সুবেদার জাহিরুল ইসলাম (বরিশালবাসী)।

অঞ্চল (গ) : চাঁদপুর সদর ও হাইমচর থানা, কমান্ডার– সার্জেন্ট জয়নাল আবেদীন চৌধুরী।

অঞ্চল (ঘ) : ফরিদগঞ্জ, রামগঞ্জের পশ্চিম অংশ, কমান্ডার– নায়েব সুবেদার আব্দুর রব।

অঞ্চল (ঙ) : সম্পূর্ণ কচুয়া থানা, কমান্ডার– হাবিলদার সিরাজুল ইসলাম।

প্রথম পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ—গাজীপুরের প্রথম যুদ্ধ (২৭-০৪-৭১)

অঞ্চলগুলো ভাগ করার পর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন শুধু প্রতিরোধ নয়, এখন থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পাক-সেনাবাহিনীর ওপর আঘাত হানবে। মুক্তিবাহিনী পাকসরকারের ফরিদগঞ্জ এল এসডি গোডাউন থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। এই খবর পাক-বাহিনীর কাছে পৌঁছার পর তারা ফরিদগঞ্জ আক্রমণের জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে। একদিন রাতে ঠিকই পাকবাহিনী ফরিদগঞ্জ চলে আসে। প্রথমদিকে তারা ফরিদগঞ্জের চতুর্দিকে পরিখা খনন করে তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে। মুক্তিবাহিনীর লোকজন এই বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখছিল। একদিন দুপুরে খবর এলো ফরিদগঞ্জ পাক-বাহিনীকে অস্ত্র গোলাবারুদ ও খাদ্য সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতার জন্য একটি লঞ্চ চাঁদপুর থেকে ফরিদগঞ্জ আসছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী মুক্তিবাহিনীর বিশ্বস্ত কয়েকজন লোক পাকবাহিনীর সাথে দোসর হিসেবে যোগ দেয়। তারা গোপনে প্রয়োজনীয় খবরাখবর মুক্তিসেনাদের কমান্ডারকে জানাতো। ইচলী নামক স্থানে একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টে খবর পৌঁছাত তারা। সেখান থেকে সাইকেলে তা বিভিন্নভাবে মুক্তিসেনাদের ক্যাম্পের কমান্ডারের কাছে পৌঁছাত। সে সময়ে মধুমতি কোম্পানীর অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার পাইকপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ এবং পাইকপাড়া হাইস্কুলে ছিল। মুক্তিসেনাদের খবর সংগ্রহের যে নেটওয়ার্ক ছিল তা একমাত্র সংগ্রাম কমিটির দুই/এক জন ও সেনা অধিনায়ক জহিরুল হক পাঠান ছাড়া অন্য কেউ জানতো না। পাকবাহিনী আসছে এই খবর পাওয়ার সাথে সাথে পাঠান তার অধীনস্থ কমান্ডারদের নিয়ে যুদ্ধের একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে উদ্দীপনামূলক বক্তব্য রাখেন এবং দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য সাথীদের ইস্পাত কঠিন শপথ করান। তিনি বুঝাতে সক্ষম হন, আজকের প্রথম আক্রমণে আমরা যদি নিজেদের শক্তির পরিচয় দিতে পারি তাহলে আমাদের যে সাফল্য আসবে তা হবে সুদূরপ্রসারী। আমরা এলাকার জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারবো, টিকে থাকার মনোবলসহ অস্ত্র, গোলাবারুদ যুদ্ধের জন্যে যা প্রয়োজন তার সবই পাব। পাঠান প্রথমে একটি প্লাটুন চান্দ্রাবাজার এলাকায় মোতায়েন করেন। সেখানে পরিকল্পনা অনুযায়ী ডিফেন্স স্থাপন করার ভালো স্থান না থাকায় পুনরায় গাজীপুরের তিনদিক থেকে ডিফেন্স বসান। একটি প্লাটুন পাইকপাড়ায় রিজার্ভ রাখা হয়। তার নির্দেশে ধানুয়া এবং চান্দ্রাবাজার ও ফরিদগঞ্জ রাস্তায় কার্ফু দেয়া হলো। কোনো লোক বাহির থেকে ভিতরে আসতে পারবে, কিন্তু বাহিরে যেতে পারবে না। নায়েব সুবেদার জহিরের প্লাটুন মানিকরাজ নদীর বাঁকে (শহীদ মেম্বারের বাড়ির সামনে), সুবেদার রবের প্লাটুন গাজীপুর কাঠের ব্রীজ থেকে বাজার পর্যন্ত, আর একটি প্লাটুন গাজীপুর ঈদগাহ ময়দান ও ফরিদগঞ্জ রাস্তা কাভার করে ডিফেন্স তৈরি করে। কমান্ডার গাজীপুর বাজারে সবার মধ্যস্থলে অবস্থান নেন। পূর্বেই তার নির্দেশ ছিল হামলা শুরু হবে গাজীপুর থেকে কমান্ডারের নির্দেশে। অর্থাৎ পাকবাহিনীর লঞ্চটি যখন মুক্তিসেনাদের এমবুশের মাঝখানে আসবে তখন কমান্ডারের ফায়ার ওপেন হবে। কমান্ডারের ফায়ারের সাথে সাথে সামনে এবং পিছন থেকে বাকীরা সমবেত ভাবে আক্রমণ করবে। মুক্তিসেনারা ডিফেন্সে প্রস্তুত। বিভিন্ন স্থানে সংগ্রাম

কমিটির লোকজন খবরা-খবর পৌঁছানোর জন্যে লোক রেখেছেন। খবর এলো পাকবাহিনীর লঞ্চটি টুবগী পর্যন্ত এসে গেছে। সারা এলাকায় সুনশান নিরবতা বিরাজ করছে। আমরা একটি বিশেষ সুযোগের অপেক্ষায় আছি। আমাদের অপেক্ষার সময় অতিক্রম করে পাকবাহিনীর লঞ্চটি আমাদের আক্রমণের সীমানায় প্রবেশ করলো। ধীরে ধীরে লঞ্চটি বাক ঘুরে গাজীপুর সোজাসুজি ঠিক কমান্ডারের টার্গেট বরাবর পৌঁছল। প্রতিশোধের আগুনে মুক্তিসেনাদের শরীর কাঁপছে, কমান্ডার অর্ডার করল, ফায়ার। বলার সাথে সাথে গাজীপুরের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে শুরু হলো আক্রমণ। মুক্তিযোদ্ধাদের ত্রিমুখী আক্রমণে পাক-বাহিনীর অনেকেই গুলি খেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিল। কেউ কেউ পাল্টা আক্রমণ করার চেষ্টা করলো কিন্তু মুক্তিসেনাদের তিনদিকের গুলির সামনে টিকতে না পেরে নদীতে ঝাঁপ দিল। তাদের কিছু সংখ্যক সেনা নদী সাঁতরিয়ে অপর পাড়ে গিয়ে ওঠে। তারা ধানুয়ার ভেতর দিয়ে ফায়ার করতে করতে রাস্তায় উঠে ফরিদগঞ্জে পালিয়ে যায়। এদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে লঞ্চটি ছিদ্র হয়ে যায়। লঞ্চটি এক সময় গাজীপুরের শেষ মাথায় শেখবাড়ির ডানে (শেখবাড়ির টেক) নিমজ্জিত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা তখনো বাঙ্কারে আদেশের অপেক্ষায় আছে। কমান্ডার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি তার দীর্ঘ চাকরি জীবনে পাক সেনাদের আচরণ সম্বন্ধে ভালোভাবে অবহিত ছিলেন। পরবর্তী আক্রমণ ফরিদগঞ্জ বা অন্যকোনো স্থান থেকে আসতে পারে সে চিন্তা তার মধ্যে কাজ করছিল। কিন্তু স্বাধীনতা পাগল বীর বাঙালি নিপীড়িত জনতার দল সকল নির্দেশ উপেক্ষা করে চরাচর কাঁপিয়ে জয় বাংলা, জয় বাংলা, শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে লঞ্চটি যেখানে নিমজ্জিত হলো সেখানে উপস্থিত হতে শুরু করলো। জনতা নদী থেকে পাক-সেনাদের লাশ টেনে পাড়ে নিয়ে আসে। পাঠান এবং মুক্তিসেনারা হতভম্ব হয়ে তামাশা দেখছেন তখন। জনগণের উৎসাহ দেখে মুক্তিসেনারা নির্বাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে। সংগ্রাম কমিটির কিছু লোক নিজেরা জনতাকে বুঝালেন, আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার জহিরুল হক পাঠানের নির্দেশ আপনারা নিরাপদ স্থানে চলে যান। যে কোনো মুহূর্তে পাক-বাহিনী গাজীপুরে আসতে পারে। জনগণ চলে যাওয়ার পর পাঠান কড়া পাহারা ব্যবস্থা করে ডিফেন্স বসান। পরের দিন জনগণ কমান্ডারের হুকুম পেয়ে নিজেরাই পানিতে নেমে কোমরে রশি বেঁধে লঞ্চটি টেনে পাড়ে নিয়ে আসে। লঞ্চটিতে ছিল প্রচুর অস্ত্র সস্ত্র। মুক্তিসেনারা পাকবাহিনীকে পরাজিত করেছে এই খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই যুদ্ধের সাফল্যে মধুমতি কম্পানীতে বাহিনীর বিরাট পরিবর্তন আসে। পাকসেনাদের কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ২টি হেভি মেশিনগান, ১টি ৩ ইঞ্চি মর্টার, ১টি রকেট লাঞ্চার, ৪টি চাইনিজ এলমএমজি ও রাইফেলসহ প্রচুর গোলাবারুদ দখল করে। জহিরুল হক পাঠান দলের সেনা সদস্যদের দিয়ে কড়াইয়ে গরম করে ভিজে যাওয়া বুলেট গুলো ব্যবহারের উপযোগী করে নেন। এই দখলকৃত অস্ত্রকে সম্বল করে শুরু হলো আমাদের অগ্রযাত্রা।

অস্ত্র ও গোলাবারুদ হাতে আসার পর পাঠান তার বাহিনীকে নতুন করে অস্ত্রসজ্জিত করেন। চাঁদপুরে মধুমতি কোম্পানীর আওতাধীন অঞ্চল তথা চাঁদপুর, লক্ষীপুর ও

লাকসাম অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। পাইকপাড়ায় উপস্থিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পাইকপাড়াকে কেন্দ্র করে একটি আঞ্চলিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার কারণ তখনো কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো নির্দেশ বা সহযোগিতা এ অঞ্চলে এসে পৌঁছায়নি। তখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। গাজীপুরের সফল যুদ্ধ চাঁদপুর অঞ্চলের প্রতিরোধ সংগ্রামে নতুন মাত্রা যোগ করে।

প্রকৌশলী মো. দেলোয়ার হোসেন

জন্ম : ১৩ জানুয়ারি ১৯৫২, চাঁদপুর। শিক্ষা : চট্টগ্রাম সরকারি কলেজিয়েট স্কুল এবং চাঁদপুর কলেজ। গণযোদ্ধা হিসেবে ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন চাঁদপুর এলাকায়। ২৫ মার্চের অব্যবহিত পর প্রাথমিক প্রতিরোধে চাঁদপুর এলাকায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

বহুমুখী সামাজিক ও সাহিত্যের কর্মকাণ্ডের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৭টি। মো. দেলোয়ার হোসেন একজন গর্বিত রোটারিয়ান।

একাত্তরের সংক্ষিপ্ত জবানবন্দি
সৈয়দ মইনুর রহমান

আমি মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মইনুর রহমান, পিতা মরহুম মুক্তিযোদ্ধা ডা. সৈয়দ ওবায়েদুর রহমান, সৈয়দ মঞ্জিল-১১০, শায়েস্তানগর পৈলরোড হবিগঞ্জ, বর্তমান- ১৭/১ নূরানী, বনকলাপাড়া, সুবিদ বাজার, সিলেট। আমি স্বাধীনতাযুদ্ধে একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা, তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র, সিলেট রণাঙ্গনে ৪নং সেক্টরের জালালপুর সাব সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করি। সাব সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মাহবুবুর রব সাদী (পরবর্তীতে বীর প্রতীক)। বৃহত্তর সিলেটে একমাত্র আমরাই বাবা-ছেলে একত্রে একই ক্যাম্পে থেকে যুদ্ধ করছি। পিতা সন্তানদেরকে সব সময় নিরাপদে রাখেন। আমার বাবা দেশের স্বার্থে আমাকে হাতে ধরে যুদ্ধে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার বাবা মরহুম ডা. সৈয়দ ওবায়েদুর রহমান ১৯৪৭ এর আগে কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। দেশ ভাগ হওয়ার পর নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ময়মনসিংহের সরকারি হসপিটালে চাকরিরত অবস্থায় বাবার সিলেটের বিশ্বনাথ থানার এক বন্ধুর অনুরোধে চাকরি ছেড়ে বিশ্বনাথে চলে আসেন। বিশ্বনাথে তখন কোনো ভালো ডাক্তার ছিলো না, কবিরাজদের উপরই সবাই নির্ভর ছিল। বাবা বিশ্বনাথের ফাউন্ডার আওয়ামীলীগার। কর্ণেল আতাউল গনি ওসমানীর সঙ্গে বিশ্বনাথের বালাগঞ্জে আওয়ামী লীগের কর্মকান্ড শুরু করেন। ঊনসত্তরের গণ আন্দোলন সত্তরের নির্বাচন ও একাত্তরের ২৫ মার্চ কালরাত্রি পর্যন্ত রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। পাক সেনা একাত্তরের বর্বর অত্যাচারের সময় বাবা তাদের ওয়ানটেড ছিলেন, ধরতে পারলে মেরে ফেলত অবশ্যই। কিছুদিন আত্মগোপনে থেকে পরে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। জালালপুর সাব সেক্টরের মোডিক্যাল অফিসার হিসাবে নিয়োগ পান। সিলেট শহরে আমাদের বাসা ছিল। চার ভাই এক বোনের বড় আমি, আমরা সিলেটেই লেখাপড়া করতাম। ২৫ মার্চ আক্রমণের ৩/৪ দিন পর শহর ছেড়ে বিশ্বনাথের পশ্চিম দিকে গ্রামে চলে যাই। এপ্রিলের মাঝামাঝি বাসার অবস্থা দেখার জন্য সিলেট আসি। সিলেট শহরের প্রবেশমুখ চন্ডিরপুল নামক স্থানে পাক বাহিনীর চেকপোস্টে গাড়ি থেকে নামিয়ে সবাইকে চেক করত। গাড়ি থেকে নামতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, এক সেনা আমার পিঠে রাইফেলের বাট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে। এতে আমি রাস্তায় পড়ে যাই। মনে হয়েছিল মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে। ব্যথায় চোখে পানি এসে যায়। সবাইকে লাইনে দাঁড় করায়, আমিও কোনোক্রমে উঠে লাইনে দাঁড়ালাম। কলেমা বলতে হবে। সবাই কলেমা শুনালো,

আমার নিকট যখন এল রাগে, ব্যথায় ও ভয়ে মুখে কলেমা শুদ্ধ করে বলতে পারলাম না, কী মনে করে আর মারধর করে নাই। মার খেয়ে মনে জেদ আসল, এর প্রতিশোধ নিতে হবে। বাবার প্রেরণা মনের জেদ টুকুই মুক্তিযুদ্ধে শক্তি যুগিয়েছে। বাসায় গিয়ে দেখি সব কিছু লুটপাট হয়ে গেছে। বাসা খালি পড়ে আছে। ভারতে চলে যাব ঠিক করেছি। এরই মধ্যে খবর পেলাম সিলেটের জগন্নাথপুর থানার শ্রীরামসি বাজার ও পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে কিছু মুক্তিযোদ্ধা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। আমি তাদের সঙ্গে যোগ দেই। কমান্ডিংয়ে ছিলেন আনছার কমান্ডার তুরণ মিয়া জায়গীরদার। অস্ত্র বলতে কয়েকটি থ্রি নট থ্রি রাইফেল, কিছু একনলা, দুনলা বন্দুক। বাজারের ও আশপাশের গ্রামের লোকজনকে ট্রেনিং দিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে। গ্রামের লোকজনকে বেসিক ট্রেনিং করানো এবং অস্ত্র চালনা শেখানো। কয়েক গ্রাম দূরে এক ডাকাতের খবর পাওয়া গেল। কমান্ডার বললেন ডাকাতের নিকট নিশ্চয় অস্ত্র পাওয়া যাবে, তাকে আক্রমণ করার দিন ঠিক করা হলো। খবর নিয়ে জানা গেল বাড়িতে আছে, তার নাম ছিল ময়না ডাকাত। তার বাড়ি রেইড করা হলো। সে বাড়িতেই ছিল। বিপদ দেখে গুলি না করে পালিয়ে যেতে চাইল। হাতের অস্ত্রসহ সারেন্ডার করার জন্য বলা হলো। সারেন্ডার না করে হাতের রাইফেল উচিয়ে ধরল, আমরা ভেবেছি গুলি করবে। সুযোগ না দিয়ে আমরা গুলি চালালাম, সে মারা পড়ল। তার বাড়ি থেকে দুইটি রাইফেল, দুইটি একনলা বন্দুক, কিছু গুলি জব্দ করা হলো। এক মাস ছিলাম শ্রীরামসিতে আমার নিকট এসব সুবিধা মনে হলো না, তাই বিদায় নিয়ে চলে গেলাম।

এক লোক টাকার বিনিময়ে ভারতের করিমগঞ্জে পৌছে দেবে। সে এপার ওপার লোক আনা নেওয়া করে, ঐ লোকের সঙ্গে আল্লাহর নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার জন্য। মা, ছোট ভাই বোনদের প্রয়োজনীয় রসদ কিনে দিয়ে যাই। শহর বাজার এড়িয়ে অনেক কষ্টে সুতারকান্দি সীমান্তের ছোট একটা হাওরের জলাশয় নৌকায় করে পাড়ি দিচ্ছি। অনেক দূর থেকে রাজাকার টহলদল দেখে ফেলে, নৌকা দিয়ে দ্রুত আমাদের দিকে আসতে থাকে। বিপদ দেখে পানিতে ঝাপ দেই। প্রাণপণে সাঁতরাতে থাকি। আমাদেরকে পালাতে দেখে দুই রাউন্ড গুলি ছুড়ে। ততক্ষণে স্থল ভাগে পৌছে যাই। তারপরও দৌড়াতে থাকি অনেকক্ষণ ধরে। কিছু লোক জমিনে চাষাবাদ করছে, তারা বলল আর দৌড়াতে হবে না। সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের অনেক ভিতরে এসে গেছ, এখন তোমরা নিরাপদ। গ্রামের একটি পুকুরে শরীরের কাঁদামাটি ধুয়ে পরিষ্কার করি। আরও বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর পাকা রাস্তা গেলাম। ঐখান থেকে রিক্সাযোগে করিমগঞ্জে এসে পৌছাই। করিমগঞ্জ শহরে এসে পৌছানোর পর অনেক বাংলাদেশি পেলাম, অনেক পরিচিতও পেলাম। একটা রেষ্টুরেন্টে বসিয়ে চাটনি দিয়ে সিঙ্গারা ও চা খাওয়ালেন পরিচিত একজন। সবাই দেশের খবর জানতে চাইলেন। বাবার রাজনৈতিক বন্ধু সাবেক এমপি এডভোকেট নুরুল ইসলাম চাচার সঙ্গে দেখা করি। সব নেতারাই হোটেলে অথবা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন। নুরুল ইসলাম চাচা ইয়ুথ ক্যাম্পের একটি রুমের মেঝেতে বিছানা করে থাকতেন। আমাকে বললেন আপাতত কিছুদিন এখানে থাক, তারপর দেখা

যাবে কী করবে। করিমগঞ্জের গৌরি হোটেল একটা অভিজাত হোটেল। সব বড় নেতাগণ উক্ত হোটেলেই আড্ডা জমিয়েছেন। ইয়ুথ ক্যাম্পে ৪/৫ দিন থাকার পর জানতে পারলাম করিমগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে বেশ কিছু যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা সেবার অভাবে কষ্ট পাচ্ছেন। নুরুল ইসলাম চাচাকে বলে হাসপাতালের কাজে লেগে গেলাম। নুরুল ইসলাম চাচা মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক হিসাবে কাজ করতেন। বাবা ডাক্তার। বংশগত ভাবেই নার্সিংটা শেখা ছিল। হাসপাতালে একটা ওয়ার্ডে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা মারাত্মকভাবে আহত হয়ে বিছানায় পড়ে কষ্ট পাচ্ছেন। মাইন বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন, দুইজনের দুটো হাতই কনুইর নিচ পর্যন্ত উড়ে গেছে। একজনের বুকের পাজরের বেশ কয়েকটা হাড় ভেঙে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সের অভাব। চিকিৎসার মানও ভালো নয়। ওয়ার্ডের ভিতরে রক্ত, মাংশের পচা দুর্গন্ধ। কাজ করতে ডাক্তার নার্সদের সহযোগিতা পেয়েছি। ফেনাইল দিয়ে ওয়ার্ড পরিষ্কার করলাম। ডিডিটি পাউডার ছিটালাম। ফেনাইলের জন্য গন্ধ কিছুটা সহনীয় হয়ে এসেছে। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের যন্ত্রণা কাতরানি এখনও কানে বাজে। আমি রাতের ডিউটি করতাম, নার্স ব্রাদারদের সঙ্গে। ২০/২৫ দিন হাসপাতালে ডিউটি করেছি। আমি থাকতেই গুরুতর আহত তিনজনকে সোভিয়েত ইউনিয়নে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। হাসপাতালেও মন টিকলনা। যুদ্ধে যাওয়ার বাসনাই ছিল বেশি, এর ভিতরে বাবা এসে আমাকে নিয়ে গেলেন জালালপুর সাব-সেক্টরে। ঐখান থেকে ট্রেনিং সেন্টারে ২৮ দিন ট্রেনিং দিলাম নিয়মিত এবং জেএলডাবলিউ। আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত বিশ্বের সেরা বাহিনীদের কাতারের ঐ পাকবাহিনীর সঙ্গে আমাদের এই ট্রেনিং বলতে গেলে খেলার মতো। তারপরও এই ট্রেনিং এবং দেশপ্রেম নিয়ে শত্রু বাহিনীর উপর ঝাপিয়ে পড়লাম। বাবার দেশপ্রেম যে কত বিশাল ছিল তার প্রমাণ। সব বাবাই চায় সন্তানরা নিরাপদে থাকুক। আমি নিজেও এখন বাবা, সন্তানের স্নেহ কী বুঝতে পারছি। আমার বাবা আমাকে হাতে ধরে এনে মৃত্যুর মুখামুখি দাঁড় করিয়েছিলেন দেশের জন্য। বাবা, আমি একই ক্যাম্পে একই সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। ধন্য আমি এমন বাবার সন্তান হতে পেরে। বাংলাদেশের ভিতরে দখলকৃত দুটি এডভান্স ক্যাম্প ছিল। একটি রঘুরচর আরেকটি কারবালা। কারবালায় ইপিআর ক্যাম্প ছিল। এসবে নিয়মিত ডিউটি দিতে হতো। একবার বের হলে বাংলাদেশের ভিতর ৪/৫ দিনও থাকা পড়ত। জঙ্গল বুটের ভিতর ভেজা অবস্থায় থাকতে থাকতে পায়ের আঙ্গুলে পচন ধরে যেত। ফুট পাওডার সব সময় পায়ে দিতে হত। মশার জন্য মশকুইটো ক্রীম হাতে পায়ে মেখে মেখে শরীরের লোম পড়ে যেত। সিলেট অঞ্চলে জোকের উৎপাত খুব বেশি ছিল। জোকে খেয়ে শরীরে রক্ত অনেক ঝরিয়েছে। যারা যুদ্ধে ছিল একমাত্র তারাই বলতে পারবেন যুদ্ধের ভয়াবহতা কী কঠিন ছিল। দিনে রেকী করে সব খবরাখবর সংগ্রহ করতে হতো, রাতে এমবুস পাতা হত। এমবুসের ফাঁদে পড়েছে শত্রু বাহিনী অনেকবার। শত্রু বাহিনীর চলার পথে মাইন পাততে হতো। যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য ব্রিজ কালভার্ট, বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস করতে হতো। হাই কমান্ডের আদেশে লোবা চা বাগানে বাংলাদেশের অংশের চা

বাগানের মেশিন বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। যুদ্ধের ছোট বড় অনেক ঘটনা লিখে শেষ করার নয়। এমবুস, ফ্রন্ট ফাইট, ব্রিজ কালভার্ট ধ্বংস করতে গিয়ে আমাদের অনেক সাথী শহীদ হয়েছে। আমাদের হিট এন্ড রান পলিসি শত্রুকে খুব ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। ফ্রন্ট ফাইটে বিএসএফ আমাদেরকে কভারিং ফায়ার দিত। মাঝে মাঝে ফায়ার করার সময় সেলগুলো ভুল করে আমাদের উপরই এসে পড়ত। টু ইঞ্চি মর্টার আমরা বহন করে নিতাম। থ্রি ইঞ্চি মর্টার দিয়ে বিএসএফ কাভার ফায়ার দিত। খবর পেলাম আমি পূর্বে যেখানে ছিলাম শ্রীরামসি এলাকায় পাকবাহিনী বাইদ্দাদের নৌকায় করে লুকিয়ে পুরো এলাকা দখল করে নেয়। তারপর গ্রামের লোকজনদেরকে ডেকে আনে শান্তি কমিটি করার নামে। ভয়ে সবাই এসে জমায়েত হয়। বর্বর বাহিনী ১৯৭১ সনের ৩১ আগস্ট গুলি করে অনেক গ্রামবাসিকে হত্যা করে। শ্রীরামসীতে অযতনে অবহেলায় বধ্যভূমি আজও কালের সাক্ষী হয়ে আছে। ঐ আনছার কমান্ডার পালিয়ে বাঁচতে পেরেছেন। যদি আমি ঐখানে থেকে যেতাম তাহলে আমাকেও হয়তো মরতে হতো। বর্তমান প্রজন্ম হয়তো উপলব্ধি করতে পারবে না, দেশ কীভাবে স্বাধীন হয়েছে। নয় মাসের যুদ্ধ খুব কম সময় কিন্তু এত সহজ ছিল না। অনেক রক্ত ঝড়েছে। অনেক মা বোনের ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়েছে। আমরা যারা জীবিত আছি (মুক্তিযোদ্ধা) বর্তমান প্রজন্মের নিকট সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা আমাদের দায়িত্ব। দিন যেতে লাগলো আর যুদ্ধের তীব্রতাও বাড়তে লাগলো। জালালপুর সাব-সেক্টর কামান্ডার ছিলেন মাহবুবুর রব সাদী, অতিরিক্ত তদারকির দায়িত্ব দিয়ে হেড কোয়ার্টার থেকে ইন্ডিয়ান আর্মির ক্যাপটেন কুমারকে পাঠাল। যুদ্ধে লোকবলের দরকার হওয়ায় শরণার্থী ক্যাম্প থেকে যুবকদের ট্রেনিং দিয়ে যুদ্ধে পাঠাতে লাগলো। এমনি একজন সদ্য ট্রেনিং দিয়ে আসা এক মুক্তিযোদ্ধা, হিন্দু, শরণার্থী ক্যাম্পে কিছুদিন আগে বিয়ে করেছে। যুদ্ধে যেতে খুবই ভয় পেত। তাকে আর যুদ্ধে যেতে হল না। একদিন ভোরে সে প্রস্রাব করতে বের হয়েছে। কোত (অস্ত্রাগার) এর পিছনে প্রস্রাবে বসেছে। কোতের ভেতর একদল মুক্তিযোদ্ধা যারা সকালেই রণাঙ্গনে যাবে তাহারা অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করে নিচ্ছিল। হঠাৎ একজনের রাইফেল থেকে ফায়ার হয়ে যায়, আর গুলি গিয়ে লাগে প্রস্রাব করা রত তার উপর। পিঠের পিছন দিকে ঢুকে পেট দিয়ে গুলি বের হয়ে যায়। নাড়িভুড়ি বের হয়ে যায়। শব্দ শুনে সবাই দৌড়ে বের হলাম। আমার বাবা তার নাড়ি ভুড়িগুলো ভিতরে ঢুকিয়ে বেন্ডেজ করে মরফিন ইনজেকশন দিয়ে দ্রুত হেডকোয়ার্টারে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। আমার হাত ধরে কেঁদে কেঁদে বলেছিল, আমি বাচঁবোতো? তার বেদনাকাতর চোখের চাহনী এখনও মনে দাগ কাটে। বিকেলে সে লাশ হয়ে ফেরত এলো ক্যাম্পে। লাশ দেখে খুবই কষ্ট লেগেছিল। যুদ্ধে শহীদ হলে এতটা খারাপ লাগতো না। যার রাইফেল থেকে গুলি বের হয়েছিল আগে থেকেই সেটার চেম্বারে গুলি ঢোকানো (লোড) ছিল। অস্ত্র পরীক্ষা করার সময় ম্যাগজিন খালি অবস্থায় থাকে। রাজাকারদের ধরে আনলে শাস্তির বিধান ছিল গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা। একদিন পাহাড়ী মশার কামড় খেলেই রাজাকারি ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধের কাতারে এসে যেত। যুদ্ধ বন্দিদেরকে আমাদের ক্যাম্পে লঙ্গর খানার কাজে

লাগানো হতো। এবমুসে ফেলে যেসব মিলিশিয়া পাকসৈন্য ধরা পড়ত তাদেরকে বাধ্যতামূলক ইন্ডিয়ান আর্মির নিকট হস্তান্তর করতে হতো। দেখতে দেখতে ডিসেম্বর মাস এসে গেল। ঈদের আগেরদিন ১৯ নভেম্বর ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বড় একটা দল আমাদের ক্যাম্পে এলো ৪নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর চিত্তরঞ্জন দত্তের নেতৃত্বে। পরের দিন ঈদ, ঈদের জামাতের জন্য ইমাম দরকার। লাখাইর নিজাম ভাইর উপর দায়িত্ব পড়ল ইমাম যোগাড় করার। নিজাম ভাই আমাকে সঙ্গে করে আমাদের বাহন ট্রাক্টর নিয়ে বদরপুরে মৌলভী খুঁজতে যত জায়গায় গেলাম। কোনো মৌলভী মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নামাজ পড়াবে না। ইন্ডিয়ান মুসলমানরা আমাদেরকে ভালো চোখে দেখত না। অথচ গত দুর্গাপূজার সময় করিমগঞ্জে গিয়েছিলাম। নদীর পারে সবচেয়ে বড় যে মন্ডপ তার দুই পাশে দুই বড় প্রতিকৃতি টাঙিয়ে রেখেছিল একজন নেতাজি সুভাস বসুর অন্যজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আসার পথে এক জেলে পাড়ার ছোট একটি ছনের বাসের মসজিদে খোঁজ নিয়ে বৃদ্ধ একজন ইমাম সাহেব পেলাম। ওনাকে অনেক বুঝিয়ে রাজি করালাম। প্রায় ১২/১৩ শত মুক্তিযোদ্ধা ১ রুপি করে দিলেও ১২/১৩ শত রুপি হবে। ইমাম সাহেবকে কেউ ১ রুপি দেবেন না। ৫/১০ রুপি করেই দেবে। কথা হলো সকালে গিয়ে আনতে হবে। জামাতের পরে পৌঁছে দিতে হবে। উল্লেখ থাকে যে, MF যারা ১৫০ রুপি FF যারা ৭৫ রুপি বেতন ঠিক নয় হাত খরচ বলা চলে, পেতাম ক্যাম্প পাহাড়ের উপর। নিচে সমতল ভূমি গ্রাউন্ড। পরের দিন সকালে ঈদের নামাজ পড়তে সবাই প্যারেড গ্রাউন্ডে জমায়েত হয়েছি। কোন শব্দ নেই, যাকে বলে একেবারে সাইলেন্ট। সন্ধ্যা নামলেই সবাইকে বাংলাদেশে ঢুকে পড়তে হবে। শত্রুকে মোকাবেলার জন্য, কেমন যেন সবার ভিতরে উত্তজেনা বিরাজ করছে। একে অন্যের সঙ্গে কুশল বিনিময় পর্যন্ত নেই। ঈদের জামাত শেষ হলে খুতবা ও দোয়ার পর ইমাম সাহেবের কাঁধের রুমাল রুপি দিয়ে সবাইকে ভরে দিল, ইমাম সাহেব খুশি মনে বিদায় নিলেন। জামাতের পরে বেশ কিছু আদেশ নির্দেশ দিলেন কমান্ডারগণ, দিনে কয়েকবার কিছু মহড়াও হলো। সন্ধ্যার পর পর রাতের খাবার খেয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে সবাই একযোগে আক্রমণ করার জন্য বর্ডার পেরিয়ে দেশের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। বর্ডারেই মিত্র বাহিনীর ৫/৫ গুরখা রেজিমেন্ট আমাদের সঙ্গে মিলিত হলো। রাতেই প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ শুরু হলো। পাক বাহিনী পিছাতে থাকলো, আর আমরা মাতৃভূমি দখল করে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলাম। শত্রু বাহিনী পিছানোর সময় ব্রিজ, কালভার্ট বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করে দিয়ে যাচ্ছিল যাহাতে আমরা সহজে এগোতে না পারি। আটগ্রাম ডাকবাংলা থেকে মাইল খানিক দূরে থাকতে আক্রমণের ধরন পরিবর্তন করা হলো। কারণ জকিগঞ্জ আক্রমণ করা যাবেনা। জকিগঞ্জ আক্রান্ত হলে পাকবাহিনী করিমগঞ্জে গোলাবর্ষণ করবে।

আটগ্রাম ডাকাবাংলায় শত্রুবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি ছিল। ডাক বাংলার সম্মুখ যুদ্ধে একদল অবতীর্ণ হলো। মিত্র বাহিনী সহ বাকী সবাই কিছুটা ঘুরে পিছন দিক থেকে একযোগে বাঙ্কারে ঢুকে ঝটিকা আক্রমণ শুরু করবে। শুধু বেনেট চার্জ, এই পরিকল্পনা

অনুযায়ী সামনের দিকের দলে আমি পড়লাম। পিছন দিকের আক্রমণে মিত্র বাহিনী গুরখা ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং গণযোদ্ধাদের বড় দলটি ক্রুল করে বাঙ্কারে ঢুকে বেনেট চার্জ শুরু করে। আমরা সামনের দিক থেকে বৃষ্টির মতো গোলাগুলি শুরু করে দিলাম। ভোরের আগেই যুদ্ধ শেষ। সকালে দেখা গেল শুধু লাশ আর লাশ। একটা পাকিস্তানি সৈনিকও বাঁচতে পারে নাই। বেশ কিছু গুরখা সৈন্য এবং কিছু মুক্তিযোদ্ধাও শহীদ হন, গুরখা লাশ সকালেই ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ডাকবাংলার কাছেই গণকবর দেয়া হয়। শত্রু বাহিনীকে ডাকবাংলা থেকে একটু দূরে সরকারি গুদামের কাছে গণকবর দেয়া হয়। শত্রু বাহিনীর আহত হয়ে যারা পালিয়ে ছিল তাদের সবাইকে উদ্ধার করা হয় আশ-পাশের গ্রামগুলো থেকে। কানাইঘাট পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর, সর্ব কনিষ্ঠ তাই হয়তো আমাকেই বাছাই করা হলো, ভারতে ফেরত গিয়ে কোতের (অস্ত্রাগার) অস্ত্র এবং ক্যাম্প গুটিয়ে নিয়ে আসার জন্য। ক্যাম্পে কোত ইনজার্চ, এক বাবুর্চি ও সহকারী ছিল। ক্যাম্পে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, রাত কাটিয়ে সকালেই সব গুছিয়ে বাংলাদেশের দিকে যাত্রা করব। কোতের ভিতরেই ঘুমালাম, শেষ রাতের দিকে ঘুম ভেঙে যায় লোকজনের মৃদু কথাবার্তা শুকনো পাতায় পায়ের শব্দে। তাবুর ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম ক্যাম্পের কাছ দিয়ে বেশ কিছু লোক যাচ্ছে। কেউ কেউ সিগারেটও ফুকছে। অস্ত্র নিয়ে তৈয়ার থাকলাম ইনচার্য সহ আত্মরক্ষার জন্য। ওরা চলে গেল, আর ঘুম হলোনা, সকালে জায়গাটা পর্যবেক্ষণে গেলাম। যে দিকে লোকজন গিয়েছিল। সিগারেটের খালি প্যাকেট, খাকি পোষাকের ছেড়া অংশ, বুট জুতা জায়গায় জায়গায় ফেলে গিয়েছে। কোত ইনচার্জ ইপিআর ছিলেন, নিদর্শনগুলো দেখে বললেন পাকবাহিনী গত রাতে এদিকে গিয়েছে এবং সংখ্যায় অনেক। পরে আরও জানতে পারলাম ভারতের ধনী মুসলমানগণ পাক আর্মীকে সাহায্য করে ভারতের ভিতর দিয়ে ছদ্মবেশে পাকিস্তান পার করে। লোবার্টি গার্ডেন থেকে সংগ্রহ করা ট্রাকটরটি আমাদের অস্ত্রাগারের সব অস্ত্র, অফিসের মূল্যবান কাগজপত্র এবং রসদ অল্প যা ছিল লোড করে বাংলাদেশের দিকে রওয়ানা দিলাম। আমরা যখন আমাদের দলের সঙ্গে মিলিত হলাম, তখন সবাই সিলেট শহরের নিকটে এসে গেছেন। পাক বাহিনী রাস্তার ব্রীজ কালভার্ট ধ্বংস করে পিছু হটেছিল। আমাদের আসতে খুবই কষ্ট হয়েছে। শহরতলিতে সবাই অবস্থান নিয়েছি। ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী ঢাকায় সারেন্ডার করেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। সিলেট কিন্তু স্বাধীন হয় নাই। ১৭ ডিসেম্বর শর্ত দিল শুধু মিত্র বাহিনীর নিকট সারেন্ডার করবে। শর্ত মেনে সারেন্ডার করল ১৭ ডিসেম্বর। সিলেট সহ সমস্ত বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হলো। মেডিকেল কলেজ হোস্টেল গুলোকে অস্থায়ী ক্যাম্প করা হলো। আমরা সেখানেই উঠলাম। কয়েকদিন রুটিন ডিউটি সেরে হাতের অস্ত্র জমা দিয়ে, ইংরেজি টাইপ করা ডিসচার্জ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে বাবাসহ চলে গেলাম মা ভাই বোনদের দেখার জন্য। সিলেট শহরে কী পরিমাণ অস্ত্র মজুদ ছিল তা কল্পনার বাহিরে। দুই মাস যাবত ফেরী করে মিত্র বাহিনী অস্ত্রগুলো ভারতে নিয়ে গেল, আমরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম। ১২০ টাকা সোনার ভরি ছিল। মিত্র বাহিনী সব সোনা ক্রয় করে ভারতে নিয়ে

গেল। দেশ স্বাধীন হয়েছে অনেক দিন হয়ে গেল, তাই অনেক ঘটনার তারিখ সঠিক মনে নেই। মিত্রবাহিনী এমসি কলেজের সাইন্স লেবরেটরীর সব সরঞ্জাম নিয়ে গেল। সিলেটের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরী ছিল। মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মিলিত হলাম কী আনন্দ। পরে সনদপত্র দেওয়া হয়। বাবা নতুন করে আবার সব গুছাতে সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। আমি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। সামনে এসএসসি পরীক্ষা, আর কিছু দেখার সময় নেই। ১৯৭৭ সনে লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে পশ্চিম জার্মানীতে চলে যাই। ফ্রাংকফুর্টে দুই বৎসর লেখাপড়া করি। তারপর কর্মজীবন, তারপর ১৯৮৫ সনে দেশে চলে আসি। দেশে এসে ঠিকমতো পুনর্বাসিত হতে পারিনি, তাই ১৯৯৬ সনে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে চলে যাই। দীর্ঘ দিন থাকার পর ২০০৫ সনে আবার দেশে চলে আসি। বাবা ১ আগস্ট ২০০৬ সনে ইন্তেকাল করেন। বাবা জীবদ্দশায় কোনো সরকারি সাহায্য বা মুক্তিযোদ্ধা ভাতা নেন নি। এই পর্যন্ত আমিও নেইনি। বাবা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডে অনেক দিন নেতৃত্ব দেন। কোনো কিছু পাবার আশায় যুদ্ধ করিনি। বাবা দেশের জন্য শ্রম দিয়ে গেছেন। আমিও আমার ক্ষুদ্র পরিসরে যা পারি করে যাচ্ছি, যত দিন বেঁচে আছি দেশের সেবা করে যাব। কিশোর মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম, আমার বয়স এখন ৫৭ বছর হয়ে গেছে। সাথী মুক্তিযোদ্ধা নিজাম ভাই, আলাউদ্দিন ভাই, আমার বাবাসহ অনেকেই পরপারে চলে গেছেন, আমিও যাব। এমন একদিন আসবে যখন একজন মুক্তিযোদ্ধাও পাওয়া যাবে না। স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য বা প্রজন্মকে দেখানোর জন্য। মুক্তিযোদ্ধা আর সৃষ্টি হবে না। পরে যাহারা জন্মগ্রহণ করেছে তাদের অনেকেই আজ মুক্তিযোদ্ধা। এ রকম মুক্তিযোদ্ধা যেন সৃষ্টি করা না হয়। জীবিত অবস্থায় যদি সম্মান না পাই মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় সম্মান দিয়ে কী হবে? করুণা নয় উপযুক্ত সম্মান যেন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা পায় এই আবেদনটুকু সবার কাছে রইল। স্বাধীনতা যুদ্ধে ও পরবর্তীতে যত মুক্তিযোদ্ধা পরলোক গমন করেছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে শেষ করছি।

তারিখ ১০ অক্টোবর ২০১০

সৈয়দ মইনুর রহমান

জন্ম : ১ জুলাই ১৯৫৫, হবিগঞ্জ। শিক্ষা: রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল, সিলেট। মদনমোহন কলেজ, সিলেট। কিশোর মইনুর বাবা ডা. সৈয়দ ওবায়দুর রহমানের হাত ধরে যুদ্ধে যান। বাবা ও ছেলে পাশাপাশি যুদ্ধ করছেন– কী আনন্দের, কী বিরল ঘটনা। তারা যুদ্ধ করেন ৪ নম্বর সেক্টরের জালালপুর সাব-সেক্টরের অধীনে। রোটারিয়ান সৈয়দ মইনুর রহমান মুক্তিযোদ্ধা অন্তপ্রাণ একজন মানুষ।

একাত্তরের কথকতা
-অনারারী ক্যাপ্টেন মো. আফাজুল হক

এক.

বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানি হানাদারদের দখলে। আমরা বাঙালি দামাল ছেলেরা দলে দলে যোগ দিচ্ছি মুক্তিযুদ্ধে। দেশ মাতৃকাকে মুক্ত না করা পর্যন্ত নিস্তার নেই আমাদের। কিন্তু অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমাদের না ছিল পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ না ছিল উন্নত প্রশিক্ষণ। সেই লক্ষ্যে মাত্র কয়েক সপ্তাহের হলেও প্রশিক্ষণ চাই।

ভারতের পানিঘাটা। মুক্তিযুদ্ধের অনেকগুলো প্রশিক্ষণ শিবিরের একটি। জংগলাকীর্ণ সুউচ্চ বৃক্ষরাজির ছায়াতলে এর অবস্থান। একই সময়ে ছয়টি উইং পাঁচ সপ্তাহের অনিয়মিত যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেছি। আমি ছিলাম ডেল্টা উইং এর অধীনে। এ উইং-এ আমরা ছিলাম ১২০ জন মুক্তিযোদ্ধা। প্রশিক্ষণের শুরুতেই ভাষা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। প্রশিক্ষকবৃন্দ হিন্দিভাষী। যত রকম হুকুম নির্দেশ সবই দেন হিন্দিতে। আমরাও বাধ্য হয়েই হিন্দি ভাষা রপ্ত করেছি এবং মনোযোগের সাথে কঠোর প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। অবশ্য বাঙালিদের জন্য এটা কোনো সমস্যা নয়। যে কোনো কঠিন কিছু হলেও অল্প সময়ে রপ্ত করতে বাঙালিরা পটু, বিশেষ করে ভাষার ক্ষেত্রে। আর এখনতো আমাদের জীবন মরণ সমস্যা মোকাবেলা করা প্রয়োজন। সুতরাং হিন্দি ভাষা আয়ত্তে আনতে আমাদের খুব সময় লাগলো না। হিন্দি ভাষার সঙ্গে আবার বাংলা ভাষার একটা চমৎকার মিল আছে। তাই দু'সপ্তাহের মধ্যেই হিন্দি ভাষাটা প্রায় আয়ত্তে এসে গেল। কথা বিনিময়ে কিছুটা অসুবিধা থাকলেও বিষয়বস্তু বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি। মনে হয়, এ কাজটা ভিন্নভাষী ব্যক্তিদের পক্ষে বাংলা ভাষা রপ্ত করা অপেক্ষা এভারেষ্ট শৃংগ জয় করা অধিক সহজ কাজ।

আমাদের উইং কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন সোলেমান ইকবাল। একজন তুখোড় সামরিক অফিসার হিসাবে তার খ্যাতি আমাদের সবার মুখে মুখে। ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী ছিলেন তিনি। আমাদের প্রশিক্ষণার্থী মুক্তিযোদ্ধা সমরঞ্জন রায়ের দ্বারা বাংলা শেখার চেষ্টা করেছেন। "তুমি ভালো আছ?" বাক্যটি পাঁচ সপ্তাহ ধরে শিখলেন। তদুপরি উচ্চারণ করতেন "তুমি বালো আছে?" এতেই বিদেশীদের বাঙলা ভাষা শেখার

অপরাগতা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম। প্রশিক্ষণার্থীরা সবাই হিন্দি ভাষা শিখতে উঠে পড়ে লেগে গেছি। দৈনন্দিন যে কোনো ছোট খাটো কথোপকথনেও হিন্দি ভাষার ব্যবহার চালাতে লাগলাম। নিজ ভাষা যেন আমাদের মুখ থেকে গেল হারিয়ে। নতুন ভাষা শেখার আগ্রহে ক'টাদিন বেশ উৎসাহের সাথেই কাটল। কিন্তু কেন জানি না ক'দিনেই আমার অপর ভাষা আয়ত্ব করার উদ্দীপনায় হঠাৎ ভাটা পড়ল। মনটা অস্থির হয়ে উঠলো নিজ গ্রামের ভাষায় কথা বলার জন্য। চিত্তকে তৃপ্ত করার জন্য আর মনটা যেন নষ্টালজিয়ায় না ভুগে সে জন্য মাঝেমাঝে বন্ধুদের সাথে বাংলা কথা বলতে চাইতাম। কিন্তু আশ্চর্য! আমি বাংলায় প্রশ্ন করলেও বন্ধুদের কাছ থেকে জবাব আসতো হিন্দিতে। কদাচিৎ কেউ কেউ বাংলা বললেও হিন্দি ভাষার দাপটে তাদেরও সংলাপে মাতৃভাষা খুঁজে পাওয়া যেত না। প্রত্যেকটি কথাবার্তায় ইথারে ভেসে আসতো হিন্দির ধ্বনি ব্যাঞ্জনা। সব কিছু মিলে ভাষার ক্ষেত্রে কেবল যেন একটা ভেজাল জীবনের মধ্যে ডুবে গেলাম। মাতৃভাষায় কথা বলার জন্য হৃদয় আকুলি বিকুলি করে উঠতো। মাঝে মধ্যে মনে হতো আমরা বোধহয় শুধু খোলস বদল করে চলেছি। আমাদের পূর্ব প্রজন্ম উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, রক্ত দিয়েছে। এখন হিন্দি ভাষা আগ্রহ ভরে রপ্ত করছি আমরা তাদেরই মাত্র এক ধাপ পরের প্রতিনিধি। কী আশ্চর্য! আসলে মানুষ বোধহয় প্রয়োজনের শৃঙ্খলে বন্দী। তবুও এই ভেবে স্বস্তি পাচ্ছিলাম যে, ভাষা প্রতিষ্ঠার যে যুদ্ধ তারা শুরু করে গিয়েছিল আমরা মুক্তিযোদ্ধারা বাংলার স্বাধীনতা এনে তার সমাপ্তি টানবো আশা করছি।

প্রশিক্ষণের সময় শেষ হতে চলল। এলো শিক্ষামূলক সফরের পালা। নির্ধারিত দিনে যাত্রা করলাম কার্শিয়াং শহরের উদ্দেশ্যে। আমাদের নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন সোলেমান ইকবাল। তিনি ভারতীয় কাশ্মীর এলাকার মুসলমান। একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনি। পাঁচ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ সময়ে তার উৎসাহ ও স্নেহ ভালোবাসার ছোঁয়া সবাইকে বিমোহিত করেছিল। সব সময় আমাদের কাছে থাকতেন। তিনি যেন শুধু পরের তরে। তার নিজের আরাম আয়েস বলতে কিছু নেই। আমরা দেশ ছেড়েছি পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ফেলে এসেছি, যুদ্ধের মুখোমুখি হবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু সর্ব বিরহে ভারাক্রান্ত আমাদের মনকে তিনি রাখতেন চাঙ্গা করে। তার জানা ছিল সবার নাম। সবার ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্পর্কে ছিলেন অবহিত। আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানোর জন্য থাকতেন ব্যাপৃত। অবসরে নিজে গান গেয়ে, অভিনয় করে, কবিতা আবৃত্তি করে, কৌতুক বলে আমাদের মশগুল রাখতেন। আমরা আনন্দ হৈ হুল্লোরে অংশগ্রহণ করে ভুলে যেতাম সকল ব্যক্তিগত গ্লানি। থাকা খাওয়া ও চিকিৎসার সেবায় পরিপূর্ণ করে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিলেন যা পরবর্তীতে কাজে কর্মে কখনো ভুলিনি। বিভিন্ন অপারেশন যখন কৃতকার্য করেছি তখন বুক ভরে সহযোদ্ধাদেরও বলতে শুনেছি "আমরা ক্যাপ্টেন সোলেমান -এর সাগরেদ।" ক্যাপ্টেন সোলেমান বলতেন,

“ভালো প্রশিক্ষণই হল শ্রেষ্ঠ কল্যাণ।” কমান্ডার হিসাবে প্রশিক্ষণের মতোই প্রশিক্ষণার্থীদের সব ধরনের সমস্যা দেখাও ছিল তার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। একদিনের ঘটনা। কে যেন রিপোর্ট করলো, তাকে দেয়া খাবারে পেট ভরছে না। অমনি ক্যাপ্টেন সোলেমান তার বিছানা পেট্টা নিয়ে রান্নার তাঁবুতে হাজির। সার্বক্ষণিক তদারকি করে কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদারকে শিখিয়ে দিলেন রেশনের অভাব হয় না। নির্ভুল ব্যবস্থাপনা দিয়ে সবাইকে তুষ্ট করা যায়। চুলার ধুঁয়ায় তার চোখ ফুলে গেল। তবু সপ্তাহ খানেক রান্নার তাঁবু থেকে তাকে সরানো গেল না। শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই জোর অনুরোধ জানালে নিজ তাঁবুতে যেতে রাজি হলেন।

পা টেনে টেনে আট হাজার ফুট উঁচুতে উঠে গেলাম। এটাই কার্শিয়াং শহর। পানিঘাটা থেকে আঁকাবাঁকা সর্পিল পথ। প্রায় ১১ মাইল দূরত্ব। পাথরের পর্বত কেটে নির্মিত হয়েছে রাস্তা। একধারে সুদৃশ্যময় সুউচ্চ পর্বতমালা অন্য ধারে অতল গভীর হ্রদ। পর্বত চুইয়ে রাস্তার উপর দিয়ে বইছে পানি। রাস্তাটা পিচ্ছিল হয়ে মরণ ফাঁদ রচনা করেছে। একবার পা ফঁসকে গেলে অতল হ্রদে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যু। দু’একখানা গাড়ি অতি ধীরে ধীরে উঁচু ঢাল অতিক্রম করে চলেছে। একেবারে পর্বতের মাথায় কার্শিয়াং শহর। ভারতের অন্যতম স্বাস্থ্যকর স্থান এই মনোরম কার্শিয়াং। প্রাকৃতিক দৃশ্যে সাজানো। প্রকৃতির বর্ণাঢ্য সমারোহে পরিস্পুষ্ট নিসর্গের যুক্ত উপহার বিধাতা যেন নিজ হাতে ঢেলে দিয়েছেন এর সমৃদ্ধিতে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু দেখতে ইচ্ছা হয়। দেখতে দেখতে মন ভরে যায়। ক্ষণকালের জন্য হলেও হৃদয় হারিয়ে যায় প্রকৃতির সৌন্দর্যের উৎসবে। পৃথিবীর দিগন্ত রেখাটা কার্শিয়াং থেকে মনে হয় অনেক প্রশস্ত। আর মনে হয় এ শহরের চতুর্দিকে বিশাল ক্যানভাসের উপর শিল্পী যেন নিপুণ হাতে এঁকেছেন শ্যামল রং-রমণীর দু’টো বিস্তৃতি আঁখি। চারিদিকে শুধু সবুজ আর শ্যামলের মেলা। আমরা ঘোরাফেরাতেই আছি। উপভোগ করছি প্রকৃতির রূপসুধা। হঠাৎ দক্ষিণ দিক থেকে ঘন কালো মেঘ ভেসে এসে আমাদের গা ভিজিয়ে দিয়ে গেল। গায়ে হাত দিয়ে দেখি কাপড়-চোপড় ভেজা ভেজা। যে মেঘ শুধু এতদিন আকাশে দেখেছি, সে মেঘের শীতল স্পর্শ পেয়ে মনটাও যেন কোমল হয়ে উঠলো। পাহাড়ের গায়ে বাধা পেয়ে মেঘ আবার রওনা করলো দক্ষিণ দিকে। কী অদ্ভুত সে দৃশ্য। ভূগোলে পড়েছি, বাংলাদেশের উত্তরে পাহাড় আছে। সে পাহাড়ে মেঘ বাধা পেয়ে আবার ফিরে আসে আর বাংলাদেশের মাটিকে উপহার দেয় বৃষ্টি। যে বৃষ্টিতে দেশের মাঠ ভরে উঠে শস্য-শ্যামলা ফসলে। আমরা কিছুক্ষণের জন্য মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেলাম। আবার মেঘ সরে গেল। আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। এ যেন এক দিবা স্বপ্নের মতো ব্যাপার। পানিঘাটা থেকে রাতে কার্শিয়াংকে দেখেছি যেন তারকা ভরা নভোমণ্ডলীয় শহর। কৃষ্ণকায় রজনীতে যেন দৃশ্যমান ছায়া পথ। আসলে এ সব ছিল বিদ্যুৎ বাতির খেলা। সেই তারার শহরে নিজেকে দেখে বড় খুশি লাগলো।

কার্শিয়াং অসমতল উঁচুনিচু ভূমির ভাঁজে ভাঁজে রচিত হয়েছে মানুষের আবাস। পাথরের ইটে নির্মিত হয়েছে এ সব বাড়ি ঘর। ফটকে দাঁড়িয়ে প্রহরায় আছে হাফসীর মতো লোমওয়ালা ভুটিয়া কুকুর। অপরিচিত লোক দেখলেই সিংহের মতো গর্জে উঠে আর সে শব্দ পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে মনে হয় যেন পাহাড়টা ভেঙে পড়বে। তন্বী তরুণীরা দোকানে পসরা নিয়ে বসেছে। ২৫ পয়সায় ইয়া বড় একটা আনারস কেটে খেতে দিল এক তরুণী দোকানদার। অতি সস্তা ফল। কোমল হাতের যত্নে কেটে লবন মসলা মেখে পরিবেশন করা সেই রমণীর আপ্যায়ন ভোলার মতো নয়। পাহাড়ি এলাকায় ব্যবসা বাণিজ্য মেয়েরাই করে। ঝুড়ির ফিতা মাথায় এটে কুঁজো হয়ে চলে মাইলের পর মাইল। প্রচলিত আছে এ সব মেয়েরা নাকি পর্বতের জাহাজ। সত্যিই পর্বতের পাহাড়ি রমণী। পর্বতের শিলার মতো শক্ত তাদের দেহ। আমাদের বাঙালি মেয়েদের মতো ঠোঁট রঙীন করে গায়ে হাওয়া লাগানোর সময় তাদের কোথায়। দেখলাম, শহরটিতে বসবাসরত সবাই হিন্দি ভাষাভাষী। অন্য ভাষার লোকজন থাকলেও পরিবেশের অভাবে নিজ ভাষা বলতে পারে না।

শিক্ষা সফর শেষ করে ফিরছি। পথে একজন প্রৌঢ় আমাদের উদ্দেশ্যে বাংলায় প্রশ্ন করলেন "আচ্ছা ভাই, আপনারা কি মুক্তিযোদ্ধা? আমাদের লীডার শামসুল ভাই বললেন "হ্যাঁ আমরা মুক্তিযোদ্ধা"। লোকটির মুখে বাংলা কথা শুনে বিস্ময়ে তাকালাম, কী যে ভালো লাগল বোঝাবার নয়। যারা অবচেতেনেও নিজ ভাষার তীব্র অভাব বোধ করছিলাম, সবাই লোকটিকে ঘিরে ধরলাম। নানা জনে নানা প্রশ্ন করতে লাগলাম তাকে। অবাক হলাম এই পাহাড়ি ভুটিয়াদের জায়গায় বাঙালি বাবু থাকে কী করে? জানা গেল লোকটির আদিবাস বাংলাদেশের ফরিদপুরে। পাক আমলে হিন্দু মুসলিম রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার এক পর্যায়ে ভারতে চলে আসেন এবং জীবনের তাগিদ তাকে কার্শিয়াং শহরে নিয়ে এসেছে। লোকটি বললেন, "বীর মুক্তিযোদ্ধা ভায়েরা, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি বাংলাদেশটা যতশীঘ্র সম্ভব স্বাধীন হোক। আমি আমার স্মৃতি বিজড়িত পৈতৃক ভিটাবাড়ি শুধু একবারটি দেখব। আর আত্মীয় স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলা ভাষায় দু'টো কথা বলে মন তৃপ্ত করব। আমার আর কিছু চাওয়ার নেই। অন্তত একবার এ সুযোগ পাবার ভাগ্য যেন ঈশ্বর আমার কপালে রাখেন।" দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে কাঁদো কাঁদো গলায় উচ্চারণ করলেন, "হায় বাংলা, কতদিন আমি তোমার রূপ দেখিনি। কতদিন আমি তোমার ভাষায় কথা বলিনি।.... সেদিন তাকে আমি একটা প্রশ্ন করলে বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।" পাঁচ সপ্তাহ মুক্তচিত্তে বাংলা ভাষা বলতে না পারায় আমার হৃদয়ে যে ক্ষুধা লেগেছে, আপনি অনেক বছর বাংলা বলতে না পেরে এ হিন্দি রাজ্যে কী করে আছেন? লোকটি যেন বোবা হয়ে গেলেন। চোখ মুখ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এলো আমার প্রশ্নের জবাব। দেখলাম, তার গণ্ডদেশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে অশ্রুর নহর। আমি তার চোখে যেন দেখলাম বাংলার পদ্মা, মেঘনা, যমুনার উচ্ছল তরঙ্গ প্রবাহ।

প্রশিক্ষণ শিবির থেকে চলে যাবার দিনে ক্যাপ্টেন সোলেমানের কাছ থেকে বিদায় নেয়া আমাদের জন্য বড় কষ্ট হয়ে উঠলো। বিদায়ের সময় সমুপস্থিত। কনভয় প্রস্তুত। দীর্ঘদেহী শিখ ড্রাইভাররা গাড়ির স্টিয়ারিং এর পাশে দণ্ডায়মান। শুধু হুকুমের অপেক্ষা। আমরা অধীর আগ্রহে ক্যাপ্টেন সোলেমানের জন্য অপেক্ষা করছি। আশীর্বাদ নেব, উপদেশ নেব। কিন্তু তাঁর খোঁজ নেই। শেষ পর্যন্ত আমাদের দলনেতা শামসুল ভাইসহ আমরা ক'জন তার তাঁবুতে গেলাম। দেখলাম বিছানায় মুখ গুঁজে কাঁদছেন। আমাদের উপস্থিতিতে মাথা উঠালেন। বললেন, "এ ক'সপ্তাহে তোমরা যে মায়া জালে জড়িয়েছ— তোমাদের সামনে গেলে আমার চোখ দুটোর পানি থামাতে পারব না। তার কান্না দেখে আমরাও হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলাম। অনুরোধ জানালাম, "স্যার আপনার আশীর্বাদ ছাড়া আমরা যুদ্ধে যেতে অক্ষম। সবাই আপনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আমাদের সাথে তিনি আসলেন। শুরু হলো কান্নার ঝড়। প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ভাবে বুকে জড়িয়ে কয়েক মিনিট ধরে কাঁদলেন। পুত্রবৎ স্নেহে মাথা ও দেহ বুলিয়ে দিলেন। কান্না স্তিমিত হলে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা রাখলেন। ইংরেজিতেই বক্তৃতা দিয়েছিলেন। যার অর্থ হল 'মুক্তিকামী ভায়েরা। পরাধীনতার কাছে কখনো মাথা নোয়াবে না। জীবন বাজি রেখে হানাদারদের বিদেয় করো বাংলার মাটি থেকে। যুদ্ধে অনেকে জীবন হারাবে। দেশ স্বাধীন হলে তোমরা নিজ দেশে চলে যাবে। তোমাদের কারো সাথে হয়তো আর দেখা হবে না। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ রইল সবার প্রতি। মনে রেখো, জীবনের চাইতে দেশ অনেক বড়। খোদা হাফেজ।"

আমরা গাড়িতে উঠেছি। শুনলাম ক্যাপ্টেন সোলেমান আমাদের সাথে যাবার অনুমতি পেয়েছেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ ধরনের একটি আবেদন আগেই করেছিলাম। থুকুড়াবাড়ী ইয়ুথ ক্যাম্পে এসে একটা অপারেশন দলের নেতৃত্ব নিলেন। গোলান্দাজ বাহিনীর মর্টার সাপোর্টের ব্যবস্থা হল। লাহিড়ী হাটের পাকিস্তান বাহিনীর অত্যন্ত শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে দিতে সক্ষম হলাম সেই অপারেশনে। আমাদের হস্তগত হল প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র, গোলাবারুদ। ফিরে এসে খুব উল্লসিত হলাম। ক্যাপ্টেন সোলেমান আমাদের সাহাসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। আমাদের সাফল্য যে প্রকারান্তরে তারই সাফল্য এ ভেবে খুব আনন্দ অনুভব করলেন। তারপর হঠাৎ নীরব হয়ে আকাশ পানে চেয়ে রইলেন। চক্ষু দু'টো তার ছল ছল করে উঠলো। তার এ আকস্মিক নীরবতার রহস্য তখন স্পষ্ট করে বুঝিনি। কিন্তু এখন মনে হয় সেদিন কি তিনি তার নিজ মাতৃভূমি কাশ্মীরের স্বাধীনতার স্বপ্নই দেখছিলেন?

দুই.

যুদ্ধের স্মৃতি চিরকালই বিভীষিকাময়। তবুও বিপদ সংকুল মুহূর্তের ছোট বড় সকল ঘটনাই এমন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ভাস্বর হয়ে আছে যা কখনও ম্লান হবার নয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এমন অনেক বেদনাদায়ক অথচ অনুপম অনির্বাণ দৃশ্যাবলী মনের স্মৃতির কোঠায় চিত্রিত রয়েছে যা ভাষায় প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার কর্তৃক গেরিলা দলভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের দৈনিক ২ টাকা হারে ভাতা দেয়া হতো। এই স্বল্প আর্থিক ভাতায় আমাদের দৈনন্দিন ব্যয়ভার বহন করা ছিল দুঃসাধ্য। সে সময় স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য সহযোগীতা না পেলে যুদ্ধ করা কঠিন হয়ে পড়তো; বিশেষ করে পাকসেনাদের মতো জগত বিখ্যাত চৌকষ বাহিনীর বিরুদ্ধে কৃতিত্ব অর্জন করা কোনো ভাবেই সহজসাধ্য ছিল না। অকৃত্রিম নিবেদিত প্রাণ দেশপ্রেমিক জনগণ অনেক সময় নিজে উপোস করেও মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্যপণ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। ধনী-দরিদ্র সবাই যার যার সাধ্যমতো মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অকৃপণ উদার হৃদয়ে প্রসারিত করেছেন সাহায্যের হাত। তাদের ক'জনের কথাই আজ আমরা মনে রাখতে পেরেছি। কিংবা তাদের অবদানকে মূল্যায়ন করার কতটুকু প্রয়োজন বোধ করি। কিন্তু দুর্দিনে অজপাড়াগাঁর ঐ সব অখ্যাত ব্যক্তিরাই আমাদের থাকা খাওয়া ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আত্মোৎসর্গ পর্যন্ত করেছেন। কালাতিক্রমের কারণেই কি না জানি না। সম্ভবত আমাদের মনের দৈন্য তাদের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে।

একদিনের কথা। আমাদের ২২ জন মুক্তিযোদ্ধার দুপুরের খাবারের যোগাড় নেই। কী করি? বর্তমান পঞ্চগড় জেলার (বৃহত্তর দিনাজপুরের পঞ্চগড় মহকুমা) আটোয়ারী উপজেলায় পাকিস্তানি বর্বর সেনাদের অত্যাচারে হাট বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ সবকিছু প্রায় বন্ধ ছিল। আমরা সে স্থানেই হাইড-আউট করে নিশিদিন যাপন করি আর সুযোগ সুবিধামতো পাক সেনাদের রাতের ঘুম দিনের আরাম হারাম করার জন্য আচম্বিত আক্রমণ করি এবং ফিরে আসি। কিন্তু আমাদের পেটপূজার ব্যবস্থা কী? তড়েয়া হাট সংলগ্ন বড় ধাপ, ছোট ধাপ, প্রেমগঞ্জ, কাটালী এসব গ্রামে ছিঁটে ফোঁটা ক'জন লোক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তখনও নিজ বাড়িতে থাকতেন। বাকী অধিকাংশই পাক সেনাদের ভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন সীমান্ত এলাকায় নতুবা ভারতীয় শরনার্থী শিবিরে।

আমরা নিরুপায়। টাকা থাকলেও সরবরাহ নেই। সেদিন দেড় বেলা প্রায় অনশনে কেটে গেল। অনন্যোপায় হয়ে এক সংগতিপন্ন অথচ বিধ্বস্ত পরিবার কর্তাকে অনুরোধ জানাতে বাধ্য হলাম আমাদের দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করার জন্য। তিনি সলজ্জভাবে অপরাগতা প্রকাশ করলেন, কেন না পাক সেনাদের অত্যাচারে তার অবস্থাও অত্যন্ত বিপন্ন। সব কিছুই অচল। তখন পাশে দাঁড়ানো ছিলেন একজন সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধ। এতক্ষণ আমরা তাকে খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে খেয়াল করিনি। আমাদের অভূক্ত অসহায় অবস্থার কথা হয়তো তিনি শুনে থাকবেন। জীর্ণ বস্ত্রে শীর্ণ দেহখানি আধো ঢাকা। শীতের প্রকোপে এবং বয়সের অমোঘ নিয়মে শরীরের ত্বক বন্ধুর হয়ে নদীমাতৃক বাংলাদেশের

মতো শত সহস্র খাল বিলের সৃষ্টি হয়েছে। বৃদ্ধটি আমাদের কাছে ঘেঁষে দাঁড়ালেন। আমরা এ উপেক্ষিত বৃদ্ধকে দূরে চলে যাবার জন্য ধমক দিতে যাব ঠিক সেসময় তিনি আমাকে আনুমানিক আধা-সের চাল নিতে অনুরোধ করলেন। ক্ষীণদেহী লোকটির অতিদারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। কাঁধে একটি ছেঁড়া বস্ত্রের পোটলা। তার দিকে মনোযোগ দেয়ার মানসিকতাও তখন অনুপস্থিত। কিন্তু তার চাল দান করার ইচ্ছা আমাকে আকৃষ্ট করল। বৃদ্ধের ডান কাধে হাত রেখে বিনীতভাবে বললাম, "চাচা, আমরা সংখ্যায় ২২ জন। আপনার আধা-সের চাল দিয়ে আমাদের কিছু হবে না"। কিন্তু বৃদ্ধটি নাছোড়বান্দা। তার আধাসের চাল নিতে খুব অনুনয় করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তার কাকুতির কাছে পরাজিত হলাম। নেহায়েত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হলাম বৃদ্ধের দান গ্রহণ করতে। চাল দিতে দিতে বৃদ্ধটি যা উচ্চারণ করলেন তাতে আমার ভিমড়ি যাওয়ার অবস্থা। তিনি বললেন, "মুই বাপ একজন ভিক্ষুক মানুষ। গ্রামের লোকজনও বেশি নেই। যা দু'চারজন আছে তাদের আপন আপন অসুবিধাও ঢের। ভিক্ষা খুব একটা পাওয়া যায় না। মোর লগত একসের চাল আছে মোটে। এথ্‌থেকেই আধা-সের দিমু। মোর ঘরত কিচ্ছু নেই বাবা, আর কী দিয়ে তুমাল্লাক সাহায্য করমু। এ কীসের চালের সবটাই দিবার পারনুহে, কিন্তু শরীলটা আইজ ভালো নেই। ভিক্ষা করবার তাকত পাই না। তাই কোনোরকমে বাকী আধা-সের চাল রান্না করে পানিভাতে স্ত্রী, বিধবা মেয়েটি আর মুই রাতটা কাটায় দিমু"।

বহুধা রংয়ের কাড়া আকাড়া চালগুলো দেখেই বুঝলাম বহুঘর থেকে সংগৃহীত। ভিক্ষার চাল দান হিসেবে নিতে আমার দ্বিধা হল। আমি বৃদ্ধটিকে অনুরোধ জানালাম, "চাচা মিয়া, আপনি যে মহানুভবতা, যে ত্যাগ দেখিয়েছেন সেটাই যথেষ্ট, আপনার চাল ফিরিয়ে নিন"। বৃদ্ধ এবার অশ্রুসজল চোখে জবাব দিলেন, "বাবাজি, মুই বৃদ্ধ মানুষ। যুদ্ধে যাবার শক্তি মোর শরীলে নেই। তাছাড়া মোর যুবক ছেলেও নেই যে, যুদ্ধে পাঠিয়ে মুক্তিযোদ্ধার বাবা হমু। বাংলাদেশ স্বাধীন করতে কত মানুষ কতভাবে অবদান রাখছেন। কেউ ধন দিচ্ছেন, কেউ জান দিচ্ছেন। অনেকেই মান হারাচ্ছেন। কিন্তু মোরত কিছুই নেই। মুই ধন সম্পদ শূন্য। জানটার যেটুকু আছে তা শুধু যমদূতের জন্য। মোর এই ভিক্ষা করা চালটাও নিলে অন্তত নিজে নিজে সুখ পামু যে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার আল্লাহ্ তৌফিক দিল"।

বৃদ্ধের দন্তহীন ফোকলা মুখের দৃঢ় আশা আর সজল নয়ন দুটোর করুণ চাহনী দেখে তার দানকে প্রত্যাখ্যান করার সাহস আমার হল না। আমি এবার শুধু বললাম, "চাচা মিয়া, আমাদের জনমপ্রিয় দেশটাকে শত্রুমুক্ত করতে অনেক লোকের অসংখ্য সাহায্য, অসীম ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছে এবং আরো হতেই থাকবে, কিন্তু আপনি আপনার দেহ নিংড়ানো সঞ্চয়ের অর্ধেক দান করে যে দৃষ্টান্ত রাখলেন তার তুলনা নেই। আপনি প্রশিক্ষণ নেননি, অস্ত্র হাতে যুদ্ধেও অবতীর্ণ হননি। তবু আপনি একজন সুযোগ্য সক্রিয়

নিরস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা। তখন আমার আবেগও বাধভাঙা জোয়ার হয়ে উঠল। আমি বললাম, আর আপনাকে নিরস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা থাকতে দেব না। এই নিন আমার হাতিয়ারটা স্পর্শ করুন"। আমার হাতের এস-এল-আর হাতিয়ারে তার হাত ছোঁয়ালাম। তার হাতেই ককিং হ্যান্ডেল ধরে কক করালাম। ট্রিগারে আঙুল দিয়ে ফায়ার করার পদ্ধতি দেখিয়ে দিলাম। এরপর আমি ঘোষণা করলাম, "আজ থেকে আপনিও সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা হলেন। হয়ত অসংখ্য সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা এদেশের জন্য জানপ্রাণ দেবে। বহু বিত্তবান তাদের ধন সম্পদ উৎসর্গ করবে। তবু আপনার ভিক্ষালব্ধ সঞ্চয়ের অর্ধেক দান করে যে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন তার দাম জগত সমান, এর পরিমাণ সমস্ত জলরাশি অপেক্ষাও বেশি"।

এ কথাগুলোর কতটা সরবে আর কতটা নীরবে বলেছিলাম আজ আর মনে পড়ছে না। আর কথাগুলোর কতটুকু ঐ বৃদ্ধ বুঝেছিলেন তাও নির্ণয় করতে পারিনি। একাত্তরের সেই দানশীল বৃদ্ধ এখন বেঁচে থাকার কথা নয়। সেদিন ফেরার সময় পঞ্চগড় জেলার স্থানীয় ভাষায় অশ্রুভেজা চোখ আর ভাঙা অস্পষ্ট উচ্চারণে বৃদ্ধটি বলছিলেন, "মুই মুক্তিফৌজ হইচুরে (আমি মুক্তিফৌজ হলাম)"।

সীমান্ত এলাকায় অসংখ্য ব্যক্তির দান দক্ষিণা আমরা পেয়েছি। জনযুদ্ধে জনসমর্থন ও অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধন সম্পদ দিয়ে কিংবা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের যারা সাহায্য সহযোগীতা করেছেন তাদের অবদানকে বিরাট করে দেখা দরকার। এদেশের অসংখ্য সহজ, সরল লোকদের অকৃত্রিম ও সক্রিয় সহযোগিতা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। তারা নিজেদের শত অসুবিধার মধ্যেও মাতৃক্রোড়ের মতো মুক্তিযোদ্ধাদের আগলে রেখেছে। জীবন বাজি রেখে পাক সেনাদের গতিবিধি আমাদের জানিয়েছে। ভাতের থালার অর্ধেক আমাদের দিয়েছে। স্বাধীনতার জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার এমন স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের স্মৃতি মনে করলে বিমুগ্ধ হয়ে যাই। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। এ ব্যস্ততার ভিড়ে এসব ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র বৃহৎ অবদানকে মনে পড়ে।

আজও কখনো বিজয় দিবসে কিংবা স্বাধীনতা উৎসবে যখন নিরিবিলিতে থাকি কিংবা একাত্তরের বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস পড়ি তখন মনে পড়ে ক'মাস হাড়সর্বস্ব দন্তহীন ঐ বৃদ্ধের কথা, নির্ণয় করতে ইচ্ছে হয় তার দানের মূল্য, আর একটি বাক্য প্রতিধ্বনিত হয় "মুই মুক্তিফৌজ হইচুরে"।

তিন.

১৭ নভেম্বর ৭১। আটোয়ারী এ্যাম্বুশের জন্য এ দিনটিই নির্ধারিত হলো। নভেম্বরের মাঝামাঝিতে এ্যামবুশের এ স্পট ঠিক হয়ে গিয়েছিল। পঞ্চগড়ের আটোয়ারী থানা সদরে অবস্থিত নিরাশি হাট। রবি ও বৃহস্পতিবারে হাটটি বসে। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা স্থানীয় লোকদের দ্বারা নিরাশি হাট থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনাকাটা করে আনতাম। কিন্তু

নিরাশি হাট পাকসেনাদের দখলে। হানাদাররা এখানে খবরদারী করতে আসে। তাদের উদ্দেশ্য মুক্তিযোদ্ধাদের হাটবাজারের সুযোগ নষ্ট করা, সন্দেহভাজন লোকদের পাকড়াও করা আর দালাল মীরজাফরদের যোগসাজোসে মুরগি-খাসীসহ অন্যান্য সামগ্রী জোর করে নিয়ে যাওয়া।

পাক সেনাদের অত্যাচারে লোকজন অতিষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশ্বস্ত ইনফরমারের মাধ্যমে জানলাম, শত্রু সেনারা সংখ্যায় পনেরো বিশ জন। তারা একটি টহল দল হিসেবে হাটে এসে সকাল নয়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত খবরদারী করে। এটা ওটা ইচ্ছেমতো নিয়ে ফিরে যায়। কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করে না। রুহিয়া-পঞ্চগড় পাকা সড়ক তাদের যাতায়াতের পথ। পর পর তিনজন ইনফরমার থেকে অভিন্ন রিপোর্ট পাওয়া গেল। আমরা নিশ্চিত হলাম যে ফাঁদ পাতলে এ শিকার ফাঁদে পা ফেলবেই।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয় অপারেশনটা তিনটি গেরিলা দল মিলে সম্মিলিতভাবে করবো। গেরিলা নিয়মে আমরা ক্ষুদ্রাস্ত্র বহন করি। এস এম জি, এল এম জি, এস এল আর ইত্যাদি ছাড়া শক্তিশালী অন্যকোনো হাতিয়ার আমাদের ছিলনা বললেই চলে। কদাচিৎ কোনো কোনো দলের সাথে হয়তোবা একটি করে টু-ইঞ্চ মর্টার পড়তো। তবে বিস্ফোরক দ্রব্যের সরবরাহ ছিল পর্যাপ্ত। হাই এক্সপ্লোসিভ, কর্‌ডেক্স সেফটি ম্যাচ, সেফটি ফিউজ, ডেটেনেটর এসবের অভাব ছিলনা। গভীর রাতে পাকসেনাদের বাংকারের আশে পাশে বিস্ফোরণ ঘটাই। ব্যস, রাতের ঘুম তাদের হারাম হয়ে যায়। আমাদের কাজ হলো, ব্রীজ ভাঙা, কারখানা ধ্বংস করা, রেল লাইন উড়িয়ে দেয়া; রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন করা এবং বিদ্যুৎ ও টেলিফোন খুঁটি কেটে দেয়া। হিট এন্ড রান পদ্ধতিতে শত্রুবাহিনীকে ত্যাক্তবিরক্তে রাখা। গেরিলা দলগুলোতে আঠার থেকে বাইশজন পর্যন্ত জনবল থাকতো। অন্ততঃ আট-দশটি হ্যান্ড গ্রেনেড একটি কাপড়ের থলেতে রাখতাম। রাতে ওটা বালিশ হিসাবে কাজ করতো। দু'একটা প্রাইম করেও রাখা হতো তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য। আজ তা মনে করে গা শিহরে ওঠে। ভাগ্যিস গ্রেনেড ভর্তি ব্যাগ আমাদের মাথাটা উড়িয়ে নিয়ে যায়নি।

আগের রাত দ্বিপ্রহরের পর রওনা করলাম। এ্যামবুশ স্পটের কাছাকাছি ওৎ পেতে থাকবো। উত্তরবঙ্গের হাঁড় কাঁপানো শীত আমাদের হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিল। তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস। আমরা ঠকঠক করে কাঁপছি। গা বরফের মতো শীতল হয়ে গেছে। আমাদের পরনে হাফশার্ট কিংবা গেঞ্জি। নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি কিংবা হাফপ্যান্ট। পাদুকাবিহীন পা। কোমরে বাঁধা থাকতো একটি গামছা। শীতবস্ত্রহীন প্রচন্ড শীতের মধ্যেও আমরা নিরস্ত্র হলাম না। বাংলাদেশ সরকারের দেয়া পঞ্চাশ টাকা পকেট মানি দিয়ে পেট পূজা করাই দুস্কর। কাপড়, চোপড় কেনার প্রশ্নই আসে না। প্রচণ্ড শীতে লোহা নাকি কুকড়ে যায় এ বাক্যটি সেদিন আমাদের সামনে বাস্তব হয়ে এল। ঠাণ্ডায় হাতের আঙুল অকেজো প্রায়। অস্ত্রগুলোও বরফ-শীতল হয়ে গেছে। হাতিয়ারে বোল্ট ঠেলাতো দূরের কথা

প্যান্টের বোতাম লাগানো দায়। কিন্তু মনোবলের সেকি দোর্দন্ড জোর। কোন বাঁধাই হিসাবে অনুভূত হচ্ছে না। নেশার ঘোরে শুধু শত্রু নিধনের কথাই ভাবছিলাম।

রাতের মধ্যেই আমরা পজিশনে চলে গেলাম। কুসার ক্ষেত (আখ) ও বাঁশ বনের মধ্যে ঘুপটি মেরে ইঁদুর ধরা বিড়ালের মতো বসে থাকলাম। এ্যামবুশের স্পটটা বেশ চমৎকার। রাস্তার একটি বিপদজনক মোড়। আমাদের বিপরীত দিকে একটি ছোট খাল। তাছাড়া নভেম্বরের মাঠভরা ধানক্ষেত। পাকসেনাদের পালাবার মতো সুবিধাজনক পথ নেই। এ্যামবুশের জন্য এটাই আদর্শ স্থান।

দিনের নয়টা পেরিয়ে গেল। শীতের শিশিরসিক্ত পোশাক গায়েই শুকিয়ে গেল কিন্তু শত্রুর দেখা নেই। ক্ষুধায় পেট চো চো করছে। পূর্বরাতে নানা টেনশনে পেটে দানাপানি পড়েনি। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের দেয়া দৈনিক ২ টাকার ভাতা দিয়েই আমাদের তিনবেলার খাবার ব্যবস্থা করতে হতো। গ্রামের লোকদের সক্রিয় সহযোগিতা অত্যন্ত স্মরণযোগ্য। গেরিলাদের প্রয়োজনে যে কোন সাহায্য করতে সাধারণ লোকজন ছিল অকৃপণ হস্ত।

কিছু নাস্তা যোগাড় করার জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রাম সুখাতীতে গেলাম। গ্রামবাসীরা আমাকে চাউলের ব্যবস্থা করে দিলেন। গ্রামের বউ-ঝিয়েরা চাউলগুলো ভেজে পেয়াজ-লবন-তেল মেখে আমার হাতে দিলেন। আমি এ্যামবুশ স্পটের দিকে রওনা হলাম।

পিছন ফিরে দেখি একটি শিশু আমাকে অনুসরণ করে দৌড়াচ্ছে। থামলাম। শিশুটিকে কাছে ডেকে বললাম, খোকা তুমি কোথায় যাবে?" শিশুটির বয়স আট/নয় বছরের বেশি নয়। শীর্ণ দেহখানি দেখে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে অনাদর, অবহেলা আর অযত্নে পরিত্যক্ত বাগানের চারার মতো শুকিয়ে গেছে। শিশুটি নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। কৌতূহল ভরে তাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, কী খোকা, তুমি মুক্তিযোদ্ধা হবে?" তৎক্ষনাৎ একলাফে আমার পা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, "হাঁ ভাইজান মুই মুক্তিফৌজ হবার চাহাচু"। পঞ্চগড় এলাকার ভাষায় শিশুটি মুক্তিযোদ্ধা হতে চায়। আমি অবাক হলাম। আমার কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। বাংলার একটি কচি শিশুও মুক্তিযোদ্ধা হতে চায়। কী আশ্চর্য! একাত্তরে স্বাধীনতাকামী পাগল প্রায় আবাল বৃদ্ধবনিতার অন্তরপোষিত ইচ্ছার প্রতীক হয়ে এলো এ শিশুটি। এমন দুর্বল দেহের একটি কচি-শিশু। তার মুক্তিযোদ্ধা হয়ে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস দেখে মুগ্ধ হতে হল। কিন্তু এ অকুতোভয় হওয়ার পিছনে যে কারণ জানলাম তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। জানতে পারলাম তার নাম সালাউদ্দিন। বেশ ক'বছর আগে তার বাবা একমাত্র শিশু পুত্র রেখে এ মায়ার ভুবন ত্যাগ করেছেন। শেষ আশ্রয় তার মাকেও পাক্‌সেনারা ধরে নিয়ে গেছে। হয়ত পৈশাচিক লালসার শিকার হয়েছে তার মা। বাবা নেই, মা নেই। কী হবে আর বেঁচে থেকে।

বললাম "যুদ্ধ করতে পারবে?" তার কোমল হাতের শক্ত মুষ্ঠি আর দৃঢ় চিত্ত দেখে

বেশ অবাক হতে হল। চিবুক ধরে মনে মনে বললাম, সালাউদ্দিন, তোমার নামে একজন মুসলমান মহাবীর ছিলেন। তাঁর ভুবন কাঁপানো শৌর্যবীর্য ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। জানিনা কত দীর্ঘ হবে আমাদের এ লড়াই। আমরা যদি এ যুদ্ধ শেষ করতে না পারি তবে তোমাদের মতো পরবর্তী প্রজন্মের দরকার হবে। আমাদের এ হাতিয়ার তুলে দেব তোমাদেরই হাতে। প্রিয়তম এ বাংলাদেশটাকে যে কোনো মূল্যে মুক্ত করতেই হবে।" ছেলেটি আমার কথা কতটুকু শুনেছিল কিংবা কী বুঝেছিল জানিনা। নাছোড়াবান্দা ছেলেটিকে একা ফেলে যেতে পারিনি। পরবর্তীতে সে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমারের কাজ করেছিল। ভিক্ষার থালা নিয়ে পাক্‌সেনাদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটি থেকে অনেক তথ্য আমাদের দিয়েছিল। জানিনা একাত্তরের সেই দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা ছেলেটি এখন কোথায় কীভাবে আছে। আজও তার অনাদর অবজ্ঞাপূর্ণ জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে কী না কে জানে। আমাদের এ অভাগা জাতি এমন ক'জন ক্ষুদে বীরের খবর রাখার ফুরসৎ পেয়েছে।

এ্যাম্বুশ সাইটে যখন ফিরে এলাম তখন প্রায় দিনের এগারটা। আমার নাস্তা বিতরণ শেষ না হতেই কাটআপ পার্টি সিগন্যাল দিয়ে বসল। শত্রু ফাঁদে পড়েছে। শুরু হল ফায়ার। বেশ কিছু অস্ত্র গোলাবারুদ দখল করা হল। রাস্তায় পড়ে রইল বেশ কয়েকটি লাশ। কিছু সংখ্যক পাক সেনা অবশ্য পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। তা সত্ত্বেও সেদিনের এ্যাম্বুশে শত্রুর টহল দলের ব্যাপক ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছিলাম আমরা। লাশ থেকে ইউনিফরম খুলে নেয়া হয়। মৃতদেহ আনার চেষ্টা ত্যাগ করলাম। বিস্তর ধানক্ষেত অতিক্রম করে মৃতদেহ আনা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। দুদিন পরে আমাদের অপারেশনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে পাকসেনারা আমাদের গোপন আস্তানা আক্রমণ করে । আর্টিলারী গোলা পড়তে লাগল। পাকসেনাদের তীব্র আক্রমণে আমরা গোপন আস্তানা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। শুরু হল গ্রামাবাসীর উপর অত্যাচার। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল। আট দশজন গ্রামবাসীকে হত্যা করল। আমাদের আশ্রয় দানকারীদের ধরে নিয়ে গেল। নিয়ে গেল কয়েকজন যুবতীকে। এক ঘণ্টার মধ্যে গ্রামবাসীর সবকিছু তছনছ হয়ে গেল। ধন গেল, জান গেল, মান ইজ্জত সবই গেল। আমার আজও মনে পড়ে গ্রামবাসীর সেই গগন বিদারী আর্তচিৎকার, বাঁচাও ....বাঁচাও........বাঁ.......চা.......ও........!!!

চার.

আমাদের দেশ মুক্ত হতে যাচ্ছে এখবর নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে জেনে গেলাম। ব্যাপারটি বেশ চমক সৃষ্টি করল আমাদের কাছে। সংবাদটা শুনে গা কীভাবে ঝংকার দিয়ে উঠেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমরা রীতিমতো থতমতো খেয়ে গেলাম। সংবাদটাতে সন্দেহের উদ্রেক হল। কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছ থেকে

প্রিয় মাতৃভূমির মুক্তি পাবার আগাম খবর পাওয়া গেল যে, তাকে নিছক মজাকের সাথে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

নভেম্বরের মাঝামাঝিতে আটোয়ারী থানার নিরাশি হাটের সন্নিকটে পাক সেনাদের টহল দলকে এ্যামবুশে ফেললাম। জানমাল বেশ ক্ষতি করা গেল। দখলকৃত অস্ত্র গোলাবারুদ জমা দেয়ার জন্য থুকুড়াবাড়ি ইয়ুথ ক্যাম্পে হাজির হলাম। উদ্দেশ্য দু'টো। প্রথমটা সাকসেসফুল এ্যামবুশের জন্য বাহবা নেয়া। দ্বিতীয়টি হল এ্যামবুশে অপারেশনে ক্ষয়কৃত এ্যামুনিশন পূরণ করার জন্য আবেদন জানানো। আমাদের আশা ছিল এবার নিশ্চয়ই আরো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক এ্যামুনিশন পাব। যা দিয়ে, আমাদের অভাবনীয় বর্ধিষ্ণু সাহসকে কাজে লাগাতে পারব।

কিন্তু আমাদের বাড়তি আশাকে ছাইচাপা দেয়ার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলো কাপ্টেন শিবুরাম। তিনি থুকুড়াবাড়ি ইয়ুথ ক্যাম্পের দায়িত্বে আছেন। আমার জানা নেই ইয়ুথ ক্যাম্পে এই ভারতীয় ইয়ং ক্যাপ্টেন শিবুরামের কী দায়িত্ব ছিল। তবে এত চৌকষ, কর্মঠ, নিষ্ঠাবান ব্যক্তি আমার চোখে দ্বিতীয়টি পড়েনি। ধর্মে শিখ সম্প্রদায়ের লোক। প্রথাগতভাবে লম্বা শিররুহ, গোঁফ শুশ্রু থাকার কথা। শিখ ধর্মানুযায়ী মাথাটি ঢেকে থাকবে পাগড়ী দিয়ে। কিন্তু বাস্তবে ওসবের বালাই নেই। তবে তিনি যে শিখ সম্প্রদায়ের লোক সেটা প্রমাণের জন্য হাতে ধাতবের শুধু একটি চুড়ি রেখেছেন। সৈনিক কাট মাথার চুল। দাড়ি মোটেই নেই। ছোট করে ছাটানো গোঁফ। হাতের চুড়িটা দেখলে শিবুরাম নামের কারণেই হিন্দু বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। সাদা হাফপেন্ট, সাদা গেঞ্জি পরেই রাতদিন থাকতেন। গেরিলা দলগুলোকে অপারেশনে প্রেরণ করার জন্য সমর সজ্জিত করেন। কোথায় কীভাবে অপারেশনে করতে হবে তার ব্রিফিং দেন। আবার অপারেশন শেষে গেরিলা দলগুলোর কাছ থেকে অস্ত্র সস্ত্র জমা নেন। অপারেশনের রিপোর্ট গ্রহণ করেন। কোথায় তিনি নেই। রাত দিন চব্বিশ ঘণ্টাই তাকে তৎপর দেখেছি। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্থায়ীভাবে প্রেরিত গেরিলা দলগুলোকে ভাতা প্রদান, অস্ত্র সস্ত্র সরবরাহ করা এবং বিভিন্ন অপারেশনাল অগ্রগতির রিপোর্ট নেয়া সর্বত্রই তিনি হাজির। তিনিই একমাত্র ভারতীয় কর্মকর্তা থুকুড়াবাড়ি ইয়ুথ ক্যাম্পে নিয়োজিত ছিলেন। তাই তার বিকল্প ভাববার অবকাশ ছিল না।

আটোয়ারী অপারেশনে দখলকৃত শত্রু সেনার ইউনিফরম, অস্ত্র ও এ্যামুনিশন ক্যাপ্টেন শিবুরামের নিকট জমা দেয়া হল। আমাদের দলনেতা আইয়ুব ভাই অনুরোধ করলেন। বললেন "স্যার অপারেশনে আমার দলের প্রচুর এ্যামুনিশন শেষ হয়েছে। পুনরায় অপারশেন করতে হলে প্রচুর গোলাবারুদ চাই"। ক্যাপ্টেন শিবুরাম আমাদের বেশ প্রশংসা করলেন। এ্যামবুশের কৃতকার্যর জন্য ধন্যবাদও দিলেন। তারপর নীরব হয়ে রইলেন। খানিকক্ষণ পর বললেন, "বহুত আচ্ছা মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, বহুত আচ্ছা"। এরপর হিন্দি ইংরেজি মিশ্রিত ভাষায় আমাদের যা জানালেন তা শুনে আকাশ থেকে

পড়লাম। তিনি বললেন, “তোমাদের আর কোনো কিছু সরবরাহ করা হবে না অপারেশনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। হাইড আউটে টিকে থাকতে না পারলে সীমান্ত এলাকায় ফিরে এসো। কিংবা চলে এসো ভারতস্থ ইয়ুথ ক্যাম্পে। মোট কথা তোমাদের আর যুদ্ধ করার দরকার নেই।”

আমরা এমন অনাকাঙ্ক্ষীত কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। বললাম, “স্যার আপনি বলেন কী? যুদ্ধ না করলে এদেশ স্বাধীন হবে কী করে? এরপর আইয়ুব ভাই সহ কানাকানি করতে লাগলাম। মনে মনে ‘শালার বেটা’ বলে গালি দেয়া বাকী থাকল না। এভাবে রণভঙ্গ দেয়ার জন্য অভিশম্পাত দিলাম। শালা মালাউন, আমাদের সাথে বেঈমানী! রাগে দুঃখে আইয়ুব ভাইয়ের চোখ দিয়ে ছলছল করে অশ্রু ঝরতে লাগল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় একথা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ছায়া আমাদের আঘাত হানল। আমরা যেন মারাত্মক হোচট খেলাম।

ক্যাপ্টেন শিবুরাম অনিতদূরে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছেন। তাকে তখন নাট্যমঞ্চের ভিলেন চরিত্রের অভিনেতা মনে হচ্ছিল। সহসা তিনি আমাদের অসহায় মনের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন। এরপর আমাদের ঈশারায় তাকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিলেন। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে পিছু পিছু হাঁটতে লাগলাম। ক্যাপ্টেন শিবুরাম একটি কক্ষে ঢুকেই বাংলাদেশের একটি ম্যাপ হাতে নিলেন। আমরা দেখলাম ম্যাপটির উপর লাল কালিতে অংকিত কতকগুলো স্থূল বিভাজন রেখা। তারপর আমাদের উদ্দেশ্যে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য দিলেন। তিনি বললেন, প্রত্যেকটি আর্মস এ্যামুনিশন এখন মূল্যবান। ভারত সরকার গেরিলা যুদ্ধের ইতি ঘটানোর নির্দেশ জারি করেছেন। ব্যাপরটি যদিও টপসিক্রেট তবুও বলছি, তোমাদের দেশটাকে স্বাধীন করে দেয়ার জন্য ভারতীয় বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধে লড়বে। তোমরা আমাদের সাথে সাথে থাকবে। পুরো রণাঙ্গনকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। সর্বোচ্চ দু'সপ্তাহের মধ্যে স্বাধীন হয়ে যাবে বাংলাদেশ। সত্যি কথা বলতে কি আমরা এখন শুধু সুপ্রীম কমান্ডের অপেক্ষায় আছি। এমন একটা হট নিউজ অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু বিশ্বাস করাও বেশ কঠিন। যে ভারত ছিল পাকিস্তানের চোখের বালি। আমরাও সেই পাকিস্তান ওয়াতনের মুশরেকী অঞ্চলের লোক। সেই চিরশত্রু দেশ আরেক শত্রু দেশের জন্য এতদিন কোটি শরনার্থীর বাড়তি ঝামেলা পোহাচ্ছে। আমরা পাচ্ছি অস্ত্র, গোলাবারুদ, প্রশিক্ষণ, পেয়ে চলেছি ভাতা ও পকেটমানি। এখন কী না আমাদের পক্ষে হতে যাচ্ছে সর্বোচ্চ উৎসর্গ। একেবারে জীবন দান। যুদ্ধ মানেই জীবন ক্ষয়। পরের জন্য বিশেষ করে শত্রুর জন্য জীবন দান করা সত্যি সত্যিই হবে কি? আমরা কি সত্যিই পেতে চলেছি স্বাধীনতা? আসবে কি আমাদের দীর্ঘ প্রতিক্ষীত মহামূল্যবান মুক্তি? এবং এত শীঘ্রই?

আমি অনেকের মুখে শুনেছি আমাদের দেশ স্বাধীন করে দেয়ার বিনিময়ে যদি কেউ বাংলাদেশের দুইহাত মাটিও চায় আমরা তাই দেব। তবু আর এই কষ্ট সহ্য হয় না।

আমাদের আত্মীয় স্বজনেরা সহ সকল শরণার্থীরা মানবেতর জীবন যাপন করছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কবলে শরণার্থী শিবিরগুলোতে কলেরা, বসন্ত রোগে লোক মারা যাচ্ছে হাজারে হাজার। লক্ষাধিক গেরিলা যোদ্ধা নিরাশ্রয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেথায় সেথায়। স্বাধীনতা পাওয়ার অনন্ত পথ আর কতদূরে কেউ জানে না। সবার এই কামনা, শেষ হোক এ দুর্গম দুর্বার দীর্ঘ পথ।

দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে বিদায় নিলাম। ফিরে গেলাম খালি হাতে হাইড আউটে। আমাদের গেরিলা সহকর্মীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। গোলাবারুদ না দেয়ার অজুহাতে সম্ভবত এই আকাশ কুসুম গল্পের অবতারণা করলেন ক্যাপ্টেন শিবুরাম। তবু কি আর করার আছে। অসহায় হয়ে বিনা অপারেশনে নিজেদের টিকিয়ে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকল না। অধীর অপেক্ষায় রইলাম সেই সুদিনের জন্য।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হলো। ডিসেম্বর মাসের তিন তারিখে ভারতীয় বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে। নয় মাসের সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা ও ধৈর্য্যের সমাপ্তি ঘটতে লাগল। আমাদের ডাক পড়ল। ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সাথে মিশে গেল মুক্তিপাগল গেরিলা যোদ্ধারা। এবার সম্মুখ যুদ্ধ। শুরু হল এগিয়ে যাবার পালা। আর, হিট এন্ড রান নয়। এবার অগ্রাভিযান, আক্রমণ, রেইড, চার্জ, দখল, ডিফেন্স ইত্যাদি ইত্যাদি। সর্বান্তে প্রতিক্ষিত বিজয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

অনারারী ক্যাপ্টেন মো. আফজুল হক

জন্ম : ১৫ জুলাই ১৯৫৮, ঠাকুরগাঁও। শিক্ষা: খোচাবাড়ি হাইস্কুল এবং রুহিয়া মহাবিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও। রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে বিএ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ ও এলএলবি। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে যোগ দেন এবং অনারারী ক্যাপ্টেন হিসেবে অবসরগ্রহণ। বিভিন্ন সেবামূলক কাজে জড়িত।

ফেনীর ফুলগাজী রেলস্টেশন অপারেশন
গোলাম মুস্তাফা

শহীদ মোসলেহ্ উদ্দিন মজুমদার একজন প্রিয় বন্ধু। তার ডাক নাম ছিল 'কচি' এবং এ নামেই তাকে আমরা ডাকতাম।

কচির চেহারাটাও ছিল কচি। চোখে মুখে শিশু সুলভ সরলতা ছাড়াও গায়ের রং ছিল বেশ ফর্সা। কচির মুখটা সবসময় ছিলো হাসিমাখা। কচি আর আমি দু'জনই ছিলাম ফেনী কলেজে'র ছাত্র। পরিচয় সেই ১৯৬৮ সালে, কলেজ ক্যান্টিনে, সিংগারা খেতে খেতে। আমাদের বন্ধুত্ব গাঢ় থেকে প্রগাঢ় হয় ট্রেনে। কচির বাড়ি ফুলগাজী, আমার বাড়ি মুন্‌শীর হাট। সকালে ট্রেনে করে কলেজে যাই। বিকেলে ট্রেনে করেই বাড়ি ফিরি। ফেনী-বিলোনীর লাইনের এ লোকাল ট্রেনেই বুট-বাদাম খেতে খেতে চলতো গল্প, আড্ডা আর সমকালীন রাজনীতি নিয়ে আলোচনা। আমরা দু'জনই ছাত্রলীগ করতাম। স্বপ্ন দেখতাম স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশের।

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের চোত্তাখোলা নামক স্থানে ফেনীর সর্বজনশ্রদ্ধেয়, চিরকুমার ও জনপ্রিয় আওয়ামী লীগ নেতা এবং এম এন এ জনাব খাজা আহমেদ একটি ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করেন। সেখানে সংক্ষিপ্ত সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কচি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। তার কমান্ডার ছিল কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানার সোরাপুর গ্রামের মৃত আবদুল হক চৌধুরীর ছেলে জয়মুল হক সাকী চৌধুরী। প্লাটুনটির নাম ছিলো 'সাকিব প্লাটুন'। বিলোনীয়া সাব-সেক্টর কমান্ডার ও ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর কমান্ডিং অফিসার মেজর জাফর ইমামের অধীনে এ প্লাটুনের কার্যক্রম পরিচালিত হতো।

১৯৭১ সালের ২১ অক্টোবর। পহেলা রমজান। ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর সিও মেজর জাফর ইমামের কাছ থেকে জরুরি বার্তা এলো। বার্তায় 'সাকি'র প্লাটুনকে 'বিশেষ দায়িত্ব' পালনের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেয়া হলো। কমান্ডার সাকি বুঝলো যে, বিশেষ কোনো অপারেশনে যেতে হবে তার প্লাটুনকে। শুরু হলো কার্যক্রম। মুক্তিযোদ্ধারা যার যার হাতিয়ার পরিষ্কার করলো। সাকি তার প্লাটুনের প্রতিটি যোদ্ধাকেই পরিমাণ মতো গোলাগুলি এবং হ্যান্ড গ্র্যানেড বণ্টন করলো। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পালাও শেষ। কিন্তু পরবর্তী নির্দেশ আর আসে না। যুদ্ধ-যাত্রার জন্য সবাই প্রস্তুত।

ক্রমেই অস্থিরতা বাড়তে থাকলো। পড়ন্ত বিকেল। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। পড়ন্ত সূর্যের আভায় 'কচি'র ফর্সা মুখটা যেন টকটকে লাল হয়ে আছে। বললো সে, "সাকি ভাই, আর কত দিন? কবে ফিরতে পারবো 'মা' য়ের বুকে, স্বাধীন বাংলাদেশে"? সাকি কিছু বলে না। পরম মমতায় শুধু কচির কাঁধে হাতটা রাখলো। কচি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সিমান্তের ওপারে তার বাড়িটার দিকে, যেখানে আকুল প্রতীক্ষায় সন্তানের ফিরে আসার প্রহর গুণছেন কচির মা। উল্লেখ্য, পুরো প্লাটুন নিয়ে সাকি অপেক্ষা করছে ভারতীয় সীমান্তের অপর পারেই ফেনী জেলার ফুলগাজী থানাধীন শ্রী বোররা গ্রাম। এ গ্রামেই কচির জন্ম। এ গ্রাম ও তার আশেপাশের অঞ্চলকে 'ফকিরের খিল'ও বলা হয়ে থাকে। কয়েকশো গজ দূর থেকেও কচিদের বাড়িটি স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। কচির বাবার নাম মরহুম মকছুদুর রহমান মজুমদার। মা ধন বিয়া মজুমদার। চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে কচি বাবা-মা'র সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান।

বিকেল ৫টার দিকে মেজর জাফর ইমাম সাহেব এলেন। সাথে হাবিলদার মোহাম্মদ ইউনুস ও বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর ১৭ জন সশস্ত্র সৈনিক। হাবিলদার ইউনুস পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীতে ইনস্ট্রাকটর ছিলেন। সন্ধ্যার পর বর্ডার সংলগ্ন ভারতের গাবতলী বাজারে মেজর জাফর ইমাম আসন্ন অপারেশনের বিষয়ে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিস্তারিতভাবে ব্রিফিং দিলেন। হাবিলদার ইউনুসকে অপারেশনের কমান্ডার নিযুক্ত করা হলো। সাকি আজকের রাতে ডেপুটি কমাণ্ডারের দায়িত্ব পালন করবে। ফেনী-বিলোনীয়া রেল লাইনের মধ্যে ফুলগাজী স্টেশনে বাংকার খুড়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তুলেছে। রাতে আশে-পাশের গ্রামগুলোতে এবং ছোট বড় সব রাস্তায় তারা 'পেট্রোল' তথা টহল দেয়। ঠিক হলো, দুশমনদের টহল দলকে 'এ্যমবুশ' করা হবে। পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে রেলস্টেশনে অবস্থানরত হানাদার বাহিনীকেও আক্রমণ করা যেতে পারে। রাত ন'টার মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ডাল, ভাত ও লাবড়া দিয়ে রাতের খাবার পরিবেশন করা হলো। সরবরাহ করা হলো আরো কিছু এম্যুনিশন। চাঁদনি রাত। প্রস্তুত সবাই।

রাত দশটার দিকে দু'জন মুক্তিযোদ্ধাকে পাঠানো হলো রেকী করতে। নির্দেশ মতো বর্ডার হতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ৩০০ গজ পর্যন্ত রেকী করে তারা নিরাপদে ফিরে এলো। তাদের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর পরিকল্পনা মোতাবেক সুশৃঙ্খভাবে নতুন যোগ দেয়া ১৭ জন সৈনিকসহ পুরো প্লাটুন বর্ডার পার হয়ে ঢুকে পড়লো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে মুক্তিসেনারা। ৩০০ গজ পর্যন্ত আগানোর পর থামলো সবাই। এবার ৪ জন মুক্তিযোদ্ধাকে আরো ৩০০ গজ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে রেকী করার নির্দেশ দেয়া হলো। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তারা ফিরে এলো। না, ঐ এলাকার মধ্যে শত্রু-সেনাদের কোনই আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়নি।

মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে চললো। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা আওয়াজ বিরক্তিকর ঠেকছে। দূর হ'তে ভেসে এলো খেক শিয়ালদের সমবেত কণ্ঠের 'হুক্কা হুয়া।'। যেন অশনি সংকেত। যেন সাবধান বাণী। এগিয়ে চলেছে প্লাটুন। সবার হাতে অস্ত্র। সামনের দিকে তাক করা। ৬০০ গজ এগিয়ে থামলো প্লাটুন। পরবর্তী ৩০০ গজ রেকী করার জন্য এবার পাঠানো হলো ৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে। নীরবে এগিয়ে গেলো তারা, ধীরে ধীরে। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে যায়, কিন্তু রেকী পার্টির ৬ জন যোদ্ধা ফিরে আসে না। সবাই উদ্বিগ্ন। এ মুহূর্তে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান শ্রী বোররা গ্রাম ও গোঁসাইপুর গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে। অদূরে নিলক্ষী গ্রামের প্রাইমারী স্কুল এবং শ্রীপুর গ্রামের কবরস্থানটিতে পাকিস্তানিদের বাংকার এবং অবস্থান আছে বলে হাবিলদার ইউনুস ও সাকির ধারণা। সময় এগিয়ে চললো। কিন্তু রেকী পার্টি ফিরলোনা। রেকী পার্টির ভাগ্য নিয়ে সবাই উৎকণ্ঠীত। এ পরিস্থিতিতে করণীয় বিষয়ে ফিস ফিস করে পরামর্শ করছে সাকি ও ইউনুস। পাশ থেকে হঠাৎ জোসের সাথে কথা বলে উঠলো কচি : "এটা আমার গ্রাম। এ গ্রামেই আমার জন্ম। এ এলাকার প্রতি ইঞ্চি জমি আমার চেনা। রেকী-ফেকীর কোনোই দরকার নাই। চলুন, আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ফুলগাজী রেল স্টেশনে পাকিস্তানিদেরকে ডাইরেক্ট এ্যাটাক করার জন্য সঠিক পথেই আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাবো। চিন্তার কারণ......" কচির কথা শেষ হওয়ার আগেই বাম ও ডান দু'পাশ থেকেই চাইনিজ এল.এম.জি.সহ অন্যান্য অস্ত্রের ফায়ারিং এর আওয়াজ ভেসে এলো। 'এ্যমবুশ' করতে গিয়ে ওঁত পেতে থাকা পাকিস্তানিদের 'কাউন্টার এ্যামবুশের' মম্মুখীন হলো মুক্তিযোদ্ধারা। কচির কথার শব্দ লক্ষ্য করে পাকিস্তানি সেনাদের নিঁখুত গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। প্রথম মুহূর্তেই শত্রু সেনাদের ব্রাশ ফায়ারে কচির বাম পাঁয়ের রানের গোড়া ঝাঁঝরা হয়ে গেলো। পড়ে গেলো কচি। কালবিলম্ব না করে পজিশন নিয়ে দু'দিকেই গুলি শুরু করলো সাকির প্লাটুন, ছুড়ে মারতে লাগলো HE 36 হ্যান্ড গ্রেনেড। পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে একটি পাহাড়ি 'ছড়া' তথা 'গড়' তথা 'নালা'। তড়িৎগতিতে মুক্তিযোদ্ধারা ক্ষীণ প্রবাহমান পানির ধারার সে 'ছড়া'তে অবস্থান নিলো। পাকিস্তানিরা সমতল ভূমি থেকে গুলি ছুড়ছে, আর মুক্তিযোদ্ধারা গুলি ছুড়ছে অপেক্ষাকৃত নীচু 'গড়' থেকে। পাকিস্তানিরা প্রায় কাছে চলে এসেছে। তাদের কথাবার্তাও শুনা যাচ্ছে। যুদ্ধ চলছে। প্রচণ্ড যুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধারা বেপরোয়া আক্রমণ রচনা করলো। শুরু হলো মরণপণ লড়াই। মুক্তিযোদ্ধারা নিচু নালায়। নালার দু'পাশে উঁচু আইল বা বাঁধ। ফলে আমাদের পক্ষে ২/৩ জন সামান্য আহত হলেও সমতলে অবস্থানরত পাকিস্তানিরা হতাহত হলো বিপুল সংখ্যায়। ইতোমধ্যে সাকির প্লাটুনের সহায়তায় পেছন থেকে প্রথমে ২´´ মর্টার এবং কিছুক্ষণ পরে ৩´´ মর্টারের গোলা নিক্ষেপ শুরু করলো ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের মর্টার প্লাটুন। মেদিনী কাঁপিয়ে সে গোলা নিখুঁতভাবে বজ্রাঘাতের মতো গিয়ে পড়লো পাকিস্তানিদের উপর।

ফুলগাজী রেল স্টেশনেও ব্যাপকভাবে মর্টারের গোলা নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাকিস্তানিদের আক্রমণের তেজ কমে গেলে গুলি করতে করতে মুক্তিযোদ্ধারা 'গড়' এর মধ্যে দিয়ে নিরাপদে ফিরে এলো ভারতীয় সীমান্তে, গাবতলী বাজারে। কিন্তু ফিরে এলোনা আমাদের সদা হাস্যময় কচি। সকলের ধারণা, কচি শহীদ হয়ে গেছে। কিন্তু কেন জানি না হাবিলদার ইউনুস কচিকে বা কচির মৃতদেহ উদ্ধারের কোনো পদক্ষেপ নিল না।

প্রকৃতপক্ষে কচি আহত হয়েছিল, নিহত হয়নি। পাকিস্তানিরা পালিয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধারা পেছনে হটে গেছে। কিন্তু কচি পড়ে আছে যুদ্ধ ক্ষেত্রে, একা। সবাই চলে গেছে! বাম পাঁয়ের রানের গোড়া একাধিক গুলিতে ঝাঁঝরা। হাঁটা সম্ভব নয়। শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি একত্র করে ক্রলিং শুরু করলো কচি। কঠিন কাজ। অসম্ভব প্রচেষ্টা। এগিয়ে যায় কচি, ধীরে ধীরে, শম্বুকের গতিতে। কাছেই মমতাজ মেম্বারের বাড়ি। মততাজ চাচার ঘরের উঠানে পৌছে যায় কচি। অসাড় শরীর। অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে কচি। কতক্ষণ, কে জানে। এক সময় জ্ঞান ফিরে আসে। নিস্তেজ শরীর নিয়ে অস্ফুট শব্দে ডাকে কচি : 'মন্তাজ চাচা, ও মন্তাজ চাচা, আমি কচি। আমি মরে যাইতেছি। আমার কাছে একটু আসেন। আমারে বাঁচান"!

ফেনী বিলোনীয়া এলাকাটি যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই ছিলো উত্তপ্ত রনাঙ্গণ। এলাকার বেশির ভাগ মানুষই যুদ্ধ, দু'পক্ষের ক্রস ফায়ার এবং পাকিস্তানিদের নির্মমতা থেকে বাঁচার জন্য ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলো। কিন্তু চাষাবাদের জন্য কিছু সাহসী বৃদ্ধ তখনো নিজ বাড়িতে থাকতো। তবে গোলাগুলি থেকে বাঁচার জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা ঘরের মধ্যে চৌকি বা পালংকের নিচে মাঝামাঝি স্থানে কবরের ডিজাইনের মতো মাটি খুড়ে তার মধ্যে খড় বিছিয়ে কাঁথা-কম্বল করে ঘুমাত। কিছুক্ষণ আগে গোলাগুলির কারণে মমতাজ মিয়া পালংকের নীচে নির্মিত কবরের চাইতে বড় সাইজের লম্বা গর্তে আশ্রয় নেয়। কচির ক্ষীণ কণ্ঠের আকুতি একসময় তার কানে পৌছে যায়। এগিয়ে আসেন তিনি। কুপি হাতে উঠানে এসে এলাকার সবচাইতে নম্র, ভদ্র ও মেধাবী ছাত্র কচিকে দেখে হতভম্ব হয়ে যান মমতাজ চাচা। দেখেন রানের গোড়ার ক্ষতস্থান থেকে অবিরত স্রোতের মতো রক্ত বেরিয়ে আসছে। ধানের ক্ষেতে পানির মধ্যে আহত হয়ে দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকার সুযোগে অসংখ্য জোঁক ছেঁকে ধরেছে কচিকে। রক্ত চুসে অনেক জোঁক ফুলে উঠেছে। কানের পাশে, চোখের নিচে, হাতে, পাঁয়ে, বুকে, পিঠে, পাঁজরে, ঘাড়ে কোথায় নেই জোঁক! হাহাকার করে উঠেন মততাজ চাচা। তারপর বগলদাবা করে ধীরে ধীরে কচিকে তিনি নিয়ে চললেন বর্ডারের দিকে। রাত ৩ টায় কচিকে নিয়ে তিনি পৌছে গেলেন গাবতলী বাজারে। সহযোদ্ধারা কচিকে কাছে পেয়ে আনন্দে উল্লাসিত। কচি বেঁচে আছে, আমাদের কচি বেঁচে আছে।

সালেহ আহমেদ কোমর থেকে গামছা বের করে কচির ক্ষতস্থান বেঁধে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। রক্তক্ষরণ চলছেই। সহযোদ্ধারা পরম মমতায় কচির সারা শরীরে লেপ্টে থাকা প্যাঁক-কাদা ধুয়ে দেয়। সাকি, সেলিম, মানিক, মালি পাথরের শাহজাহান ও খোন্দকার মোজাম্মেল কচির শরীর থেকে জোঁক ছাড়াতে ব্যস্ত। কিন্তু তা আরেক সংকট তৈরি করলো। শরীরের যেসব স্থানে জোঁক কামড়ে লেপ্টে আছে, জোঁক ছাড়িয়ে আনলে ফুটা হয়ে যাওয়া সেসব স্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। মূল ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তক্ষরণে এমনিতেই কচির শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছে। অগনিত জোঁক সরালে, জোঁক কর্তৃক কামড়ে ধরা শরীরের সেসব ফুটা হয়ে যাওয়া স্থান থেকেও যদি রক্ত বের হতে থাকে, তাহলেতো রক্ত শুন্যতাতে কচি এখনি মরে যাবে। সকলে পরামর্শ করে তাই একমত হলো যে, জোঁক গুলোর পেট কচির রক্তে যেহেতু ফুলে-ফেঁপে টইটম্বুর হয়ে আছে, সেহেতু নতুন করে রক্ত টেনে ভরার জায়গা জোঁকের পেটে আর নাই। জোঁক থাকার চাইতে জোঁক সরালে যেহেতু রক্তক্ষরণ বেশি হবে, তাই কচির শরীরে জোঁক বসা সমস্ত জোঁক শরীরে রেখে দিয়েই সহযোদ্ধারা কচিকে শুকনা ও গরম কাপড় পরিয়ে দিলো। ইতোমধ্যে গ্রাম্য এক কবিরাজ এসে চিকিৎসার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। পাহাড়ীয়া এ অঞ্চলে জনবসতী কম, যোগাযোগ ব্যবস্থার হাল করুণ এবং পাশ করা কোন ডাক্তারও নেই।

রাত শেষ হয়ে আসছে। পুবের আকাশে হালকা আলোর আভা। অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে কচি বলছে : "আমার কইলজাটা ফাঁটি যাইতেছে। আমারে তোমরা একটু পানি দাও"। তাড়াতাড়ি পানি আনা হলো। তিন ঢোক পানি খাওয়ার পর মৃদু স্বরে কচি বললো "আমার ঘুম পাইতেছে। আমার " আর কোনো কথা বের হলোনা। চোখ দু'টো বুজে এলো কচির। ঘুমিয়ে পড়লো আমাদের অতি প্রিয় কচি। সে ঘুম আর ভাঙলোনো। একেবারে বিনা চিকিৎসায় অসহায়ের মতো চিরতরে হারিয়ে গেল দেশপ্রেমিক একজন মুক্তিযোদ্ধার তরতাজা প্রাণ। কিছুক্ষণ পরে কাছের মসজিদ থেকে ভেসে এলো ফজরের আজানের ধ্বনি: "আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর"--- ডুকরে কেঁদে উঠলো কচির ৩৯ জন রনাঙ্গণের সহযোদ্ধা।

সকাল বেলা কচির মৃত্যু সংবাদ কচিদের বাড়িতে পৌছানো হলো। কচির মা, চাচা, ভাই, বোন সকলেই ছুটে এলো। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লো কচির বিধবা মা। তার বিলাপে শুধু উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধারা এবং স্থানীয় ভারতীয়রাই নয়, যেন পাহাড়, টিলা, গাছ-পালা ও পশু-পাখিরাও শোকে মূহ্যমান।

কচিকে কোথায় সমাহিত করা হবে? গত রাতের যুদ্ধে আমাদের পক্ষে শহীদ হয়েছে একজন আর আহত হয়েছে তিন জন। পাকিস্তানিরা আমাদেরকে এ্যামবুশ করেছে।

অথচ আমাদের তুলনায় তাদের হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশি। সুতরাং পুরা এলাকায় আজ তারা খুব বেশি সতর্ক ও তৎপর। বাংলাদেশের মাটিতে কবর খুড়তে গেলে পাকিস্তানিরা আমাদেরকে আক্রমণ করবেই। সুতরাং ভারতের মাটিতেই কচিকে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে ফেনী-বিলোনীয়া অঞ্চলকে বলা হতো চৌকলা রৌশনাবাদ এবং এটি ত্রিপুরার মহারাজা শ্রী মানিক্য বাহাদুরের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কচির পূর্বপুরুষগণ খুবই খানদানী পরিবারের ছিল। কালা পরী নামে তাদের বংশে এক 'ফকির' তথা বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। এখন ফকির বললে লোকে ভিক্ষুক মনে করে, মাস্তান মানে গুন্ডা। অথচ ৪০/৫০ বছর আগেও ফকির ও মাস্তান বলতে সৃষ্টি কর্তার রাহে সংসার ত্যাগী আত্মভোলা মানুষকে বুঝাতো। যাই হোক বাংলাদেশের ফকিরের খিল তথা শ্রী বোররা গ্রামের একটা অংশ ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় ভারতীয় অংশে পড়ে যায়। ফকিরের খিলের ভারতীয় অংশে কালা পীরের মাজার। সেখানে কালা পীর ছাড়াও কচিদের পূর্ব পুরুষদের অনেকেরই কবর রয়েছে।

সুতরাং কালা পীরের মাজারের পূর্ব পাশে কচির জন্য কবর খোড়া হলো।

যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ছিল সবুজের মাঝখানে লাল গোলক এবং গোলকের মধ্যে হলুদ রং এর বাংলাদেশের মানচিত্র। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তাক্ত শহীদদেরকে সমাহিত করার পূর্বে সাধারণত গোসল করানো হয় না। কাফনের কাপড় পরানোর পর কচির দেহ বাংলাদেশের সেই আদি পতাকা দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো। ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক জানাজার পর কচিকে কবরে সমাহিত করার সময়ে সামরিক কায়দায় সেল্যুট করা হলো। সঙ্গত কারণেই বিউগলের করুণ সুরের মূর্ছনা শুনা গেল না। তবে তার স্থলে আকাশ-বাতাস মথিত করে করুণ কান্নার মূর্ছনা এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য সৃষ্টি করেছিল।

কবরটির অবস্থান হলো, সিমান্ত পিলার নং ২১৩৬ এর আনুমানিক ৩০০ গজ পশ্চিমে, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর থানার সিমান্ত সংলগ্ন গাবতলী গ্রামে।

তারপর দীর্ঘ ৪০ বছর কেটে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু ভারতের মাটিতে অযত্নে, অবহেলায় ও অনাদরে শুয়ে আছে বীর শ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান, বীর শ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা কচি ও হারুনসহ জীবন দানকারী বঙ্গ মায়ের কতো সাহসী সন্তান। আমরা তাদের খবর রাখিনি। স্মরণও করিনা। তাদের কবরগুলো ঠিকমতো চিহ্নিত এবং সংরক্ষণও করা হয়নি। তাদের কবরে একটি তাজা ফুল দেয়া বা শ্রদ্ধাচিত্তে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে একটু প্রার্থনা করার মতোও কেউ নেই। কি অকৃতজ্ঞ ও স্বার্থপর জাতি আমরা। কিন্তু ব্যতিক্রম আছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন বাঙালির ছেলে নরসিংদীর রামনগর গ্রামের ফ্লাইট লেফটেনেন্ট মতিউর রহমান। পাকিস্তান এয়ার

ফোর্সের একটি বিমানসহ ভারতে চলে যাওয়ার এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেন তিনি। কিন্তু মধ্যাকাশে থাকা অবস্থায় প্লেনটি ক্র্যাশ করে। সে আরেক বীরত্বের কাহিনী। শহীদ হন মতিউর। গোসল ও জানাজা ছাড়াই অবজ্ঞা অবহেলায় তাকে কবর দেয়া হয় করাচীর অদূরে পাকিস্তান মশরুর বিমান ঘাঁটির ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কবরস্থানে। অনেক অবহেলা ও অত্যাচারের পর তার স্ত্রী ও সন্তানেরা স্বদেশে ফিরে আসে। ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর কামরুল হাসান ভূঞা (অব.) ৭ বীরশ্রেষ্ঠকে নিয়ে স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রচ্ছদ বিহীন বিস্তারিতভাবে একটি চমৎকার প্রচ্ছদ কাহিনী লেখেন। সে লেখাতেই তিনি সর্বপ্রথম বীরশ্রেষ্ঠসহ বিদেশের মাটিতে শায়িত সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দেশে নিয়ে আসার দাবি তোলেন। পরবর্তীতে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরের জীবনসঙ্গী মিলি রহমান মতিউরের দেহাবশেষ দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে রীতিমতো জনমত ও আন্দোলন গড়ে তোলেন। কবি সমুদ্র গুপ্ত (তথা কবি আবদুল মান্নান), রাজনীতিবিদ ফারুক খান, তুসার আহমেদ, ভাস্কর পাশা, লেখক অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল এ আন্দোলনে শরীক হন। দাবির বিষয়টি মিডিয়াতে প্রাধান্য পায়। ফলে এ ব্যাপারে সরকার পদক্ষেপ নেয়। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরের দেহাবশেষ বহনকারি কফিন বাংলাদেশে এসে পৌঁছায় ২৫ জুন, ২০০৬, ভোর রাত দশটায়। আবেগঘন আনুষ্ঠানিকতায় জাতি তার মরদেহ গ্রহণ করে এবং পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাকে মিরপুরের বুদ্ধিজীবি কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দালাল হতে বাংলাদেশ প্রসেনসিয়েশনের ব্যানারে জনাব ওয়ালি আহমেদের নেতৃত্বে প্রবাসী বাঙালিরা এ দাবির প্রতিধ্বনি তোলেন। মেজর কামরুল হাসান ভূঞা (অব.) সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ এর চেয়ারম্যান, আর কর্নেল সাজ্জাদ আলী জহির বীর প্রতীক এ প্রতিষ্ঠানের একজন ট্রাষ্টি। দু'জনই একাত্তরের সম্মুখ সমরের অসম সাহসী যোদ্ধা। আমাদের মাত্র ৭ জন শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ। তার মধ্যে দু'জন বিদেশের মাটিতে শায়িত। ইতোমধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরকে আমরা পাকিস্তান থেকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছি। তাহলে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান কেন পড়ে থাকবে ভারতের মাটিতে। উল্লেখ্য যে, ২৮ অক্টোবর ১৯৭১ সালে বৃহত্তর সিলেট জেলার মৌলভীবাজারের অন্তর্গত শ্রীমঙ্গলের সন্নিকটে ধলই বিওসির ভয়াবহ যুদ্ধে শহীদ হন হামিদুর। হামিদুরের বাড়ি ঝিনাইদহ জেলার খোদা খালিশপুর গ্রামে। তার সহযোদ্ধারা তাকে দাফন করে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই জিলা সদর দপ্তরের কাছে আম্বাসা শহরের নিকট পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা হাতিমারা ছড়া গ্রামে, ওই গ্রামের আবদুর রহমান ওরফে লোকমান মিয়ার পারিবারিক কবরস্থানে।

ভারত থেকে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ স্বদেশে এনে মর্যাদার সাথে সমাহিত করার কোন উদ্যোগ জাতি নেয়নি। কিন্তু এগিয়ে এলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল

সাজ্জাদ ও মেজর কামরুল। মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. এ. কে. এম. মাহবুবুল আলম বীর প্রতীক, বি.ডি.আর এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ ভারত সরকার ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর সুদীর্ঘ ৩৬ বছর পর ১১ ডিসেম্বর, ২০০৭ মঙ্গলবার ফুলে ফুলে ভরা বীরশ্রেষ্ঠদের কফিন।

অত্যন্ত সম্মানের সাথে বৃহত্তর কুমিল্লার বিবির বাজার বি.ও.পিতে এসে পৌঁছে। ১২ ডিসেম্বর ২০০৭ বুধবার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কৃতজ্ঞ জাতি তাকে সমাহিত করে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে, আরেক বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরের পাশে।

বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুরের দেশে ফিরার বিষয়টি বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা এবং টিভি চ্যানেলগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করে। খবরটি শেষ পর্যন্ত শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা মোসলেহ উদ্দিন কবির বিধবা মায়ের কানেও পৌঁছে। একদিন উনি আমাকে সেল ফোনে টেলিফোন করলেন। বললেন, "মতিউর আর হামিদুরদেরকে তোমরা আনছ, আমার কবিডারে আনি দেওনা, বাবা।" মুহূর্তের মধ্যেই স্মৃতির ভারে ন্যুব্জ হয়ে গেলাম। ছুটে গেলাম রনাঙ্গণের সাক্ষী প্রিয় বন্ধু মেজর কামরুলের কাছে। উনি আমাকে নিয়ে গেলেন পিলখানায়, বিডি.আর এর ডি.জি মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদের কাছে। কামরুল ভাই কচির মায়ের ইচ্ছার কথা বলার পর জেনারেল শাকিল আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। বললেন, কচি যেহেতু খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা নয় সেহেতু অফিসিয়েলি তার দেহাবশেষ আনতে গেলে তা হবে কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। কচি'র কবর যেহেতু ভারতের মাটিতে, কিন্তু বাংলাদেশ সিমান্তের একেবারে সন্নিকটে, আমি ভিন্ন ব্যবস্থা করবো। ভারতীয় সিমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বি.এস.এফ) ডি.জিকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করবো, যাতে স্থানীয় বি.এস.এফ ও বি.ডি.আর কমান্ডারগণ স্থানীয় জনগণের সহায়তায় কচির মরদেহ ইসলামী কায়দায় সিমান্তের এপারে এনে কচির মায়ের হাতে সোপর্দ করে এবং মর্যাদার সাথে তাকে তাদের পারিবারিক কবরস্থানে পুনরায় সমাহিত করে।

সাথে সাথেই খবরটি খালাম্মাকে, কচির মাকে জানালাম। আনন্দে আবেগে তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। নীরবে শুধু কাঁদলেন এবং অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে কিছু বললেন। জেনারেল শাকিল ছিলেন স্পর্শকাতর হৃদয়ের মানুষ। মুক্তিযুদ্ধ ও মাস তিনেক পর মুক্তিযোদ্ধার ব্যাপারে তিনি সবসময়ই ছিলেন আবেগপ্রবণ। তিনি মেজর কামরুলকে টেলিফোন করলেন এবং সহসাই কচির মরদেহ স্বদেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা চূড়ান্ত হচ্ছে বলে আশ্বস্ত করলেন।

কিন্তু হায়। ২৪ জানুয়ারি, ২০০৮ সকাল ৯-৩০ মিনিটে কচির চিরদুঃখী বিধবা মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, চলে গেলেন অতৃপ্ত মান নিয়ে। এর এক মাস এক দিন পর বি.ডি.আর বিদ্রোহ সংগঠিত হয় এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে ৫৭ জন

অফিসারসহ নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে সপরিবারে জেনারেল শাকিল আহমেদকে হত্যা করা হয়।

সন্তানহারা বিধবা মা নেই। নেই জেনারেল শাকিলও যে দেশ আর মাটির জন্য কচি তার সম্ভাবনাময় জীবনটি অকাতরে দান করলো, সেই প্রিয় স্বদেশে কচির আর ফিরে আসা হলোনা। কচি শুয়ে আছে ভারতের মাটিতে, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবহীন অবস্থায়, ঝোপ-ঝাড়ে পরিপূর্ণ নির্জন কবরে, অনাদরে অভিমানে একা।

গোলাম মুস্তাফা

জন্ম : ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০, ফেনী। শিক্ষা: আলী আজম হাই স্কুল, ফেনী কলেজ, ফেনী। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে সম্মানসহ এমএ। গর্বিত রোটারিয়ান গোলাম মুস্তাফা মানুষকে ভালোবেসে সমাজের কম ভাগ্যবানদের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট।

একাত্তরে গোলাম মুস্তাফা ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর সাথে গণযোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করেন। কমান্ডিং অফিসারের স্টাফ অফিসার ও পাইওনিয়ার প্লাটুনের একাংশের কমান্ডার হিসেবে রণাঙ্গনের বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

চোখ মেলে দ্যাখো
কামরুল হাসান ভূঁইয়া

বাড়ি যাবো বলে পথে নেমেছি
অথচ পথে দাঁড়িয়েই পথ হারালাম।
আসলে পথের প্রান্ত যত সহজে
চিনি বলে ভেবেছিলাম
তত সহজ মোটেও ছিল না।
দিগন্ত রেখা দেখে যেমন দিগন্ত
অনুমান করা যায় না, ঠিক তেমন।

দেশের 'সূর্য সন্তান' আর 'শ্রেষ্ঠ সন্তান' বলে
যারা উপচে পড়া প্রণোদনা দ্যাখায়
আদতে ওগুলিও আরেক রকম বজ্জাত।
মুক্তিযোদ্ধাদের নাম শুনলে দান-দখিনা
দেবার কথা মনে করে কাঁচুমাচু করে।

পাকিস্তানি পশুগুলির কুলাঙ্গার সহযোগীদের
ক্ষমার মতো মহৎ গুণ প্রদর্শন করারইবা
কী দরকার ছিল।
কী দরকার ছিল যিশুর মতো সব সহিষ্ণু হবার
দালাল-রাজাকারদের ঘৃণা করতে শেখাচ্ছো, ভালো কথা;
মুক্তিযোদ্ধাদেরইবা ভালোবাসতে শিখিয়েছো কবে?
তাহলে কি হাতে-পেটে উরুতে আটটি গুলি গতরে নিয়ে
বীর প্রতীক সোহানকে দারোয়ানের চাকরি করতে হয়?
বারোভাজারা বারবার বোকা বানালে
অর্থ দাঁড়ায় আসলেই আমরা বোকা।

পৌত্র-প্রপৌত্রদের বলে যাই
দেশপ্রেমের এক মৃন্ময়ী আবেগে লড়েছিলাম বলেই

তোমরা ভূমিষ্ঠ হয়ে
স্বাধীন দেশের মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নিয়েছো।
মনে রেখো, যেকোনো কিছু পরিষ্কার করতে হলে
কোনো কিছু ময়লা করতেই হয়।

এই-ই যা বলবার ছিল,
আর সবই বাহুল্য।

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া
জন্ম ২৪ জুলাই ১৯৫২, কুমিল্লা। শিক্ষা যশোর জিলা স্কুল এবং ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ। একাত্তরের ১৩ই এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষার আঠারো দিন আগে ২৫ মার্চ বর্বর ও ইতর পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালিদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করলে যোগ দেন ২ নম্বর সেক্টরে। ১৯৭৪-এর ৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে পরের বছর ১১ জানুয়ারি ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এ কমিশন লাভ করেন। ১২ জুলাই ১৯৯৬ স্বেচ্ছায় অবসর নেন। ১৯৮৩ সালে বেইজিং ভাষা ও সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চীনা ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তার বইয়ের সংখ্যা ২২টি, সামরিক ইতিহাসের উপর লেখা ১টি এবং শিশুতোষ গ্রন্থ ৩টি।